কল্যাণীয়াসু

ইন্দু

কল্যাণীয়াসু ইন্দু

জওহরলাল নেহরু

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

ইন্দিরা-কে
এই চিঠিগুলি যাকে লেখা হয়েছিল

প্রধানমন্ত্রী ভবন
নয়াদিল্লি
১ নভেম্বর, ১৯৭৩

বেশির ভাগ ছেলেমেয়ে নিজেদের মা-বাবাকে দেবতার মতো মনে করে। আমার মা-বাবা যেমন আমার পরম বন্ধু ছিলেন সে রকম কিন্তু সকলের মা-বাবা হন না। সব কিছুতেই আমার বাবার আগ্রহ ছিল। নিজের কৌতূহলকে অপরের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারলে তিনি খুশি হতেন। অনেক রকম প্রশ্ন আমার মনে জাগত। আর এই প্রশ্নগুলির জন্যেই তিনি আমাকে পৃথিবী সম্পর্কে নানা কথা বলতে পেরেছিলেন—যে সব মানুষ এখানে বাস করত তাদের কথা, তাদের আদর্শ ও কাজকর্ম এবং সাহিত্য ও শিল্পকলার মধ্য দিয়ে কীভাবে তারা অন্যদের মুগ্ধ করেছিল সেই সব কথা। সবচেয়ে বড় কথা হল, তিনি আমাদের এই বিস্ময়কর দেশের কথা বলতে এবং লিখতে ভালবাসতেন—দেশের অতীতকালের কীর্তি ও ঐশ্বর্যের কথা এবং পরে কীভাবে দেশের পতন হল এবং দেশ পরাধীন হল। একটি চিন্তাই তাঁর মনে সব সময় জেগে থাকত—তা হল স্বাধীনতা। শুধু ভারতের নয়, পৃথিবীর সকল মানুষের জন্যে স্বাধীনতা।

আমার বয়স যখন আট কিংবা নয় তখন এই বইয়ের চিঠিগুলি লেখা হয়েছিল। পৃথিবীর প্রথম যুগের কথা এবং কীভাবে মানুষ নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল সে কথা এই চিঠিগুলিতে বলা হয়েছে। এ চিঠিগুলি শুধু একবার পড়েই ফেলে দেবার মতো নয়, এগুলি পড়ে আমি নতুন চোখে সব কিছু দেখতে শিখি। এগুলি মানুষের সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করতে এবং চারপাশের জগৎ সম্বন্ধে আমার মনে আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছিল। এসব চিঠি পড়েই প্রকৃতিকে একটি বই হিসেবে দেখতে শিখেছি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তন্ময় হয়ে আমি পাথর, গাছপালা, পোকামাকড়দের জীবন এবং রাত্রে আকাশের নক্ষত্র লক্ষ্য করে দেখেছি।

এর আগে এই চিঠিগুলি বিভিন্ন ভাষায় বইয়ের আকারে প্রকাশিত হয়েছে। আমার স্থির বিশ্বাস যে এই আকর্ষণীয় পুনর্মুদ্রণ ছেলেমেয়েদের ভাল লাগবে। তাদের সামনে এক নতুন দিক খুলে দেবে, যেমন আসল চিঠিগুলি পড়ে আমার নিজের জীবনে হয়েছিল।

ইন্দিরা গান্ধী

ভূমিকা

এই চিঠিগুলি লিখেছিলাম আমার মেয়ে ইন্দিরাকে ১৯২৮ সালের গ্রীষ্মকালে, যখন সে ছিল মুসৌরীতে আর আমি ছিলাম নীচের সমতলে। এগুলি দশ বছরের একটি ছোট মেয়েকে লেখা ব্যক্তিগত চিঠি। কিন্তু বন্ধুরা এই চিঠিগুলির কিছু বৈশিষ্ট্য দেখে বলেন যে, আমার উচিত এগুলি পাঠকদের কাছে প্রকাশ করা। এই বন্ধুদের পরামর্শ সাধারণত আমি গুরুত্ব দিয়ে থাকি। জানি না এ চিঠিগুলি অন্য ছেলেমেয়েদের ভাল লাগবে কি না। আশা করি তাদের মধ্যে যারা এগুলি পড়বে তারা আস্তে আস্তে আমাদের এই পৃথিবীকে বিভিন্ন জাতি নিয়ে তৈরি একটি বৃহৎ পরিবার হিসেবে ভাবতে শুরু করবে। এবং কিছু সংশয় থাকলেও এও আশা করি যে, চিঠিগুলি লেখার সময় যে আনন্দ আমি পেয়েছি এগুলি পড়ে তারাও কিছুটা সেই আনন্দ পাবে।

চিঠি লেখা হঠাৎ শেষ করতে হয়েছে। দীর্ঘ গ্রীষ্মকাল একদিন শেষ হয়ে এল এবং ইন্দিরাকে পাহাড় থেকে নেমে আসতে হল। ১৯২৯ সালের গ্রীষ্মকালে মুসৌরী বা অন্য কোনও শৈলশহরে ইন্দিরার আর যাওয়া হয়নি। শেষ তিনটি চিঠিতে একটি নতুন যুগের কথা বলতে শুরু করেছিলাম, এগুলি হয়তো কিছুটা বেমানান লাগবে। আর লেখার সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা কম, সেজন্যে সেগুলি এখানে দিয়েছি।

বুঝতে পারি, চিঠিগুলি ইংরেজিতে লেখার জন্যে এদের পাঠক সীমাবদ্ধ। দোষটা সম্পূর্ণ আমারই। বইটির অনুবাদ প্রকাশ করেই কেবল এই ত্রুটি সংশোধন করা যেতে পারে।

জওহরলাল নেহরু

এলাহাবাদ
নভেম্বর ১৯২৯

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এই চিঠিগুলি যার জন্যে লিখেছিলাম সে ছাড়া পাঠকমহলের কাছে এগুলি পেশ করতে অনেক দিন আমি দ্বিধায় ছিলাম। কিন্তু সহৃদয় পত্র-পত্রিকা এবং তার চেয়েও সহৃদয় পাঠকবর্গ যে রকম সমাদরে বইটি গ্রহণ করেছেন তাতে আমার সাহস বেড়েছে, দ্বিধা ও ভয় দূর হয়েছে। বহু দিন হল বইটির প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হয়েছে। এমনকী লেখকের কাছেও এই 'চিঠি'র কোনও কপি নেই। সেজন্যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হচ্ছে। এবার ছোটখাট কয়েকটি ভুল সংশোধন করা ছাড়া আর কোনও পরিবর্তন করা হয়নি।

এই ছোট বইটি যেভাবে সমাদর লাভ করেছে তাতে সাহসী হয়ে আরও কয়েকটি চিঠি যোগ করার কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু আরও এক ঈর্ষাকাতর প্রিয়তমার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় এবং তাঁর সেবায় ব্যস্ত থাকায় আর কোনও ব্যাপারে মন দেবার মতো সময় বা ইচ্ছা কিছুই আমার ছিল না। গত বছর নৈনি জেলে বন্দি থাকার সময় চিঠি লেখার কথা আবার মনে আসে। তখন হাতে সময়ও ছিল। কিন্তু জেল থেকে বেশি চিঠিপত্র লেখা যায় না এবং জেলে প্রয়োজনীয় বইপত্রও পাওয়া যায় না। তবে তার চেয়েও বড় কথা তখন ভারতে প্রতিদিন যে সব ঘটনা নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করছিল, সে সবই আমার মন জুড়ে ছিল। তখন আর একেবারে অতীতের কথা ভাবার মতো সময় ছিল না। জেল থেকে ছাড়া পেলাম এবং কয়েক সপ্তাহ পরে আবার সেখানে ফিরে এলাম। কয়েক মাস কাটল। যা হোক, এ বছরের ১লা জানুয়ারি নতুন করে পণ করলাম আবার চিঠি লেখা শুরু করতে হবে। লেখা কিছুটা এগোল, কিন্তু তার পরেই অল্প দিনের মধ্যে, ২৬শে জানুয়ারি আমাকে জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হল। পারিবারিক নানা বিপদে-আপদে এবং দেশের কাজের আবর্তে জড়িয়ে পড়ে আমাকে নানা জায়গায় ছুটে বেড়াতে হয়। জেলের সেলে নির্জনে এবং শান্তিতে থেকে কবে আবার কাজটি আরম্ভ করতে পারব তারই অপেক্ষায় থাকি।

এদিকে ইন্দিরা বড় হচ্ছে এবং তার ক্রমবর্ধমান জ্ঞানলাভের সঙ্গে হয়তো বেশিদিন আর তাল রাখতে পারব না।

এলাহাবাদ
অক্টোবর ১৯৩১

জওহরলাল নেহরু

সূচিপত্র

প্রকৃতির রাজ্য ১১
প্রাচীন ইতিহাস কীভাবে লেখা হয়েছিল ১৩
কীভাবে পৃথিবীর সৃষ্টি হল ১৫
প্রথম প্রাণের সূচনা ১৮
জীবজন্তুর আবির্ভাব ২১
মানুষের আবির্ভাব ২৬
প্রথম যুগের মানুষ ২৮
বিভিন্ন জাতির উৎপত্তি ৩২
বিভিন্ন জাতি ও ভাষা ৩৫
বিভিন্ন ভাষার মধ্যে সম্পর্ক ৩৮
সভ্যতা কাকে বলে? ৪১
গোষ্ঠীর জন্ম ৪২
ধর্মের উদ্ভব এবং শ্রমবিভাগ ৪৫
কৃষিকাজের ফলে যে সব পরিবর্তন আসে ৪৮
গোষ্ঠীপতি: কীভাবে সে এল ৫১
গোষ্ঠীপতি: কীভাবে তাদের প্রাধান্য বাড়ল ৫২
গোষ্ঠীপতি হল রাজা ৫৪
প্রাচীন যুগের সভ্যতা ৫৬
প্রাচীন যুগের বড় বড় শহর ৫৮
মিশর এবং ক্রিট ৬০
চিন এবং ভারতবর্ষ ৬৪
সমুদ্রযাত্রা এবং বাণিজ্য ৬৬
ভাষা, লিপি এবং সংখ্যা ৬৯
নানা শ্রেণীর মানুষ ৭১
রাজা, মন্দির ও পুরোহিত ৭৩
ফিরে দেখা ৭৫
ফসিল এবং ধ্বংসাবশেষ ৭৬
আর্যরা ভারতে এল ৭৮
ভারতের আর্যরা কেমন মানুষ ছিল ৭৯
রামায়ণ ও মহাভারত ৮১

প্রকৃতির রাজ্য

তুমি আর আমি যখন একসঙ্গে থাকি, তুমি প্রায়ই আমাকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করে থাকো এবং আমিও সেগুলির উত্তর দিতে চেষ্টা করি। এখন তুমি আছো মুসৌরীতে এবং আমি রয়েছি এলাহাবাদে; কাজেই আমাদের মধ্যে এ ধরনের কথা বলা সম্ভব হচ্ছে না। সেজন্যে আমি মাঝে মাঝে তোমাকে চিঠিতে আমাদের এই পৃথিবী এবং যে সব ছোট-বড় নানা দেশে তা বিভক্ত তার পরিচয় সংক্ষেপে লিখে পাঠাব। ইংল্যান্ডের আর ভারতের ইতিহাস তুমি অল্প কিছুটা পড়েছ। কিন্তু ইংল্যান্ড একটি ছোট দ্বীপ এবং ভারত একটি বিরাট দেশ হলেও তা পৃথিবীর সামান্য একটি অংশ মাত্র। এই পৃথিবীর বিষয়ে যদি আমরা কিছু জানতে চাই তাহলে শুধুমাত্র একটি ছোট দেশ, যেখানে আমরা জন্মেছি, তার কথা নয়, পৃথিবীর সমস্ত দেশ এবং সেখানকার সব অধিবাসীদের কথাও আমাদের ভাবতে হবে।

মনে হয়, এইসব চিঠিতে তোমাকে অতি অল্প কথা জানাতে পারব। আশা করি সেই অল্প কথাই তোমার ভাল লাগবে এবং তুমি এই পৃথিবীকে একটি অখণ্ড দেশ এবং এখানকার অন্যান্য অধিবাসীদের নিজের ভাই-বোন হিসাবে ভাবতে পারবে। একটু বড় হয়ে তুমি অনেক বড় বড় বইয়ে পৃথিবী আর তার অধিবাসীদের কথা পড়বে। এ পর্যন্ত যে সব গল্প-উপন্যাস তুমি পড়েছ তার চেয়েও এই কাহিনী আরও ভাল লাগবে।

তুমি তো জানো আমাদের এই পৃথিবী খুবই প্রাচীন—লক্ষ লক্ষ বছর আগে এর জন্ম। দীর্ঘকাল এখানে কোনও মানুষ বাস করত না। মানুষের জন্মের পূর্বে এখানে কেবল জীবজন্তু বাস করত। জীবজন্তুদের পূর্বে এমন একটা সময় ছিল যখন পৃথিবীতে কোনও প্রাণীরই অস্তিত্ব ছিল না। সব রকমের প্রাণী এবং মানুষ যাদের নিয়ে এখনকার পৃথিবী পূর্ণ হয়ে আছে, তাদের বাদ দিয়ে সেদিনকার পৃথিবীর কথা কল্পনা করা কষ্টকর। কিন্তু বিজ্ঞানী এবং অন্যান্য যাঁরা এসব বিষয়ে গবেষণা এবং গভীরভাবে চিন্তা করেছেন তাঁরা বলেছেন যে, এমন একটা সময় ছিল যখন পৃথিবী ছিল এমনই উত্তপ্ত যে সেখানে কোনও প্রাণীর বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল না। তাঁদের লেখা বই পড়লে এবং শিলাখণ্ড ও ফসিল (প্রাচীন কালের প্রাণীর প্রস্তরীভূত দেহ) নিয়ে গবেষণা করলে আমরা নিজেরাই দেখব যে পৃথিবীটা এ রকমই ছিল।

তুমি বইয়ে ইতিহাসের কথা পড়ে থাকো। কিন্তু প্রাচীনকালে যখন মানুষের অস্তিত্ব ছিল না তখন কোনও বই নিশ্চয়ই লেখা হয়নি। তাহলে তখন কী ঘটেছিল তা আমরা কেমন করে জানতে পারি? আমরা কেবল বসে বসে সব কিছু কল্পনা করে নিতে পারি না। এরকম হলে ভালই হত, কেননা আমরা যা চাই সে রকমই সব কিছু কল্পনা করতে পারি এবং এভাবে সবচেয়ে সুন্দর রূপকথার কাহিনী তৈরি করা যায়। কিন্তু এসব সত্যি হতে পারে না, কারণ এসব তো আমাদের জানা কোনও প্রকৃত ঘটনার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে না। সেই সুদূর অতীতে লেখা কোনও বই আমাদের নেই। ভাগ্যক্রমে এমন কিছু আমাদের আছে, যা বই পড়ে যেসব শেখা যায় তেমনি অনেক কথা আমাদের জানিয়ে থাকে। আমাদের সামনে রয়েছে পাহাড়, পর্বত, সমুদ্র, নক্ষত্র, নদী, মরুভূমি এবং প্রাচীন কালের প্রাণীদের ফসিল। এসব এবং প্রকৃতির রাজ্যের এ ধরনের আরও কিছু জিনিস প্রাচীন ইতিহাস জানার পক্ষে আমাদের কাছে বইয়ের মতো। এই ইতিহাস জানার সত্যিকার

AMARBOI.COM

উপায় হল শুধুমাত্র অন্যের লেখা বই পড়া নয়, সরাসরি একেবারে প্রকৃতির রাজ্যের বিরাট দরবারে হাজির হওয়া। আশা করি পাহাড় এবং শিলাখণ্ড থেকে কীভাবে ইতিহাস জানা যায় তা তুমি শীগ্‌গির শিখতে পারবে। কল্পনা করে দেখ, ব্যাপারটি কী রকম কৌতূহলের! রাস্তার ওপর কিংবা পাহাড়ি অঞ্চলে যে সব নুড়ি তুমি পড়ে থাকতে দেখ তার প্রতিটি যেন প্রকৃতির নিজের লেখা বইয়ের এক-একটি পৃষ্ঠা। এবং তুমি সেগুলি কীভাবে পড়তে হবে যদি জানো, তবে তারা তোমাকে কিছু-না-কিছু শেখাবে। কোনও ভাষা—যেমন হিন্দি, উর্দু বা ইংরেজি—পড়তে হলে তোমাকে তাদের বর্ণমালা শিখতে হবে। সেই রকম প্রকৃতির রাজ্যের শিলা ও পাথরের গায়ে যে কাহিনী লেখা আছে তা জানতে হলে তোমাকে প্রকৃতির রাজ্যের বর্ণমালাগুলি জানতে হবে। কীভাবে তা পড়তে হয় এখন বোধ হয় তুমি অল্পই জানো। তুমি যদি একটি গোল চক্‌চকে ছোট নুড়ি দেখতে পাও, সেটি কি তোমাকে কিছু বলে? কেমন করে এটা গোল, মসৃণ আর চক্‌চকে হল, কেমন করে তার কোনাচে ভাব আর খরখরে ধার মিলিয়ে গেল? পাথরের বড় একটি চাঁই টুকরো টুকরো করে ভাঙলে দেখবে যে, তার প্রত্যেকটি টুকরো এবড়োখেবড়ো, তাতে অনেকগুলি কোণ আছে এবং ধার খরখরে। পাথরটি কোনমতেই গোল ও মসৃণ নয়। তাহলে কীভাবে টুকরোগুলি এমন গোল, মসৃণ আর চক্‌চকে হল? যদি তোমার চোখ ও কান ভালভাবে খোলা থাকে তাহলে দেখবে প্রত্যেকটি নুড়ি নিজের কাহিনী বলছে। সে বলছে যে, এক সময়—হয়তো অনেক কাল আগে—সে ছিল একটি পাথরের টুকরো, বড় পাথর ভেঙে যেমন টুকরো তুমি পাও, যার চারপাশে রয়েছে অনেকগুলি কোণ। এটি হয়তো পাহাড়ের ধারে পড়ে ছিল। তারপর এক সময় বৃষ্টি নামল। জলের তোড় তাকে ভাসিয়ে নিয়ে নীচের ছোট উপত্যকায় একটি ছোট পাহাড়ি নদীতে নিয়ে আসে। নদীর স্রোত তাকে ধাক্কা দিতে দিতে এগিয়ে নিয়ে চলে, শেষে এসে পড়ে একটি ছোট নদীতে। ছোট নদী একে বয়ে নিয়ে যায় বড় নদীতে। এভাবে সারাপথ পাথরের টুকরো নদীর তলায় গড়াতে গড়াতে চলে। এতে তার কোণগুলি ক্ষয়ে যায়, এবড়োখেবড়ো গা মসৃণ হয় এবং চক্‌চক করতে থাকে। এভাবে তা একটি নুড়িতে পরিণত হয় এবং এই নুড়িটি তুমি দেখতে পাও। কোনও কারণে নদীর স্রোত তাকে ফেলে রেখে চলে গেছে বলে তুমি সেটি দেখতে পেলে। নদী যদি তাকে আরও দূরে টেনে নিয়ে যেত তাহলে তা ক্রমে ছোট হতে হতে শেষে একটি বালুকণায় পরিণত হয়ে সমুদ্রের ধারে নিজের জাতভাইদের সঙ্গে মিশে গিয়ে একটি সুন্দর বেলাভূমি গড়ে তুলত। সেই সমুদ্রের তীরে ছোট ছেলেমেয়েরা খেলা করত, বালি দিয়ে দুর্গ তৈরি করত।

একটি ছোট নুড়ি যদি তোমাকে এত কথা বলতে পারে তাহলে আমাদের চারপাশের পাহাড় পর্বত এবং প্রাকৃতিক নানা জিনিস থেকে আমরা আরও কত-কী শিখতে পারি।

প্রাচীন ইতিহাস কীভাবে লেখা হয়েছিল

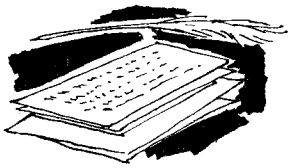

গতকালের লেখা চিঠিতে তোমাকে জানিয়েছি যে প্রকৃতির রাজ্য থেকে আমরা পৃথিবীর প্রথম যুগের কথা জানতে পারি। আমাদের চারপাশে যা কিছু তুমি দেখতে পাও—পাহাড়, পর্বত, উপত্যকা, নদী, সমুদ্র এবং আগ্নেয়গিরি—সে সবই রয়েছে এই রাজ্যে। প্রকৃতির রাজ্যের এই জিনিসগুলি রয়েছে আমাদের চোখের সামনে কিন্তু আমাদের মধ্যে ক'জনই বা সে সবের দিকে নজর দেয় বা সেগুলি ভালভাবে বুঝতে চেষ্টা করে! যদি আমরা সেগুলি ভালভাবে বুঝতে চেষ্টা করতাম তাহলে তারা রূপকথার চেয়েও মন-জয় করা কাহিনী শোনাত।

প্রকৃতির রাজ্য থেকে জ্ঞান লাভ করে আমরা অতীত কালের অনেক কথা জানতে পারি। পৃথিবীতে তখন কোনও মানুষ বা প্রাণী ছিল না। আমরা জানতে পারি কেমন করে প্রথম প্রাণীর জন্ম হল, তারপরে এল আরও নানা ধরনের প্রাণী এবং তারও পরে এল মানুষ—নারী ও পুরুষ। এখন যে ধরনের মানুষ আমরা দেখি তার চেয়ে এই মানুষ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। তারা ছিল বর্বর, অন্যান্য জীবজন্তুর সঙ্গে তাদের বিশেষ পার্থক্য ছিল না। ধীরে ধীরে তারা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এবং চিন্তা করতে শুরু করে। আসলে, এই চিন্তাশক্তিই তাদের অন্যান্য জীবজন্তুদের থেকে পৃথক করে দেয়। এই চিন্তা করার ক্ষমতাই আসল শক্তি যার জোরে তারা সবচেয়ে বড় আকারের এবং হিংস্র জন্তুদের চেয়ে নিজেদের আরও শক্তিশালী করে তুলেছে। এখন তুমি দেখতে পাও ছোট একটি মানুষ বিরাট আকারের একটি হাতির মাথায় চড়ে বসে আছে এবং তার ইচ্ছামতো হাতিকে দিয়ে কাজ করাচ্ছে। হাতি একটি বিরাট এবং শক্তিশালী প্রাণী। তার ঘাড়ে বসে-থাকা ছোটখাট চেহারার মাহুতের চেয়ে হাতির শক্তি অনেক বেশি। কিন্তু মাহুতের চিন্তা করার ক্ষমতা আছে। চিন্তা করতে পারে বলেই মাহুত হয়েছে প্রভু আর হাতি হল তার ভৃত্য। মানুষের চিন্তাশক্তি যত বাড়তে থাকে সে তত চতুর এবং অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে। মানুষ অনেক কিছু আবিষ্কার করেছে—কেমন করে আগুন জ্বালাতে হয়, কেমন করে জমি চাষ করে নিজের খাদ্য উৎপন্ন করা যায়, কেমন করে পরনের কাপড় এবং বসবাসের জন্যে ঘরবাড়ি তৈরি করা যায়। অনেক মানুষ একসঙ্গে বসবাস করতে থাকে এবং এভাবে প্রথম নগর গড়ে ওঠে। নগর গড়ে ওঠার আগে মানুষ নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াত। সম্ভবত তারা কোনও এক ধরনের তাঁবুতে বাস করত। জমি চাষ করে কীভাবে খাদ্যশস্য উৎপন্ন করা যায় তা তারা জানত না। সেজন্যে তাদের না ছিল ধান, না ছিল গম, যা থেকে রুটি তৈরি হয়। তখন কোনও শাকসবজি ছিল না। এখন তুমি যে সব জিনিস খাও, তার বেশির ভাগ তখন অজানা ছিল। মানুষ সম্ভবত কয়েক ধরনের বুনো ফল এবং বাদাম খেত। প্রধানত তারা নিজেদের শিকার-করা প্রাণীর মাংস খেয়ে বেঁচে থাকত।

নগরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নানা রকম সুন্দর সুন্দর শিল্পকলা আয়ত্ত করতে থাকে। কীভাবে লিখতে হয় সে কৌশলও তারা আয়ত্ত করল। কিন্তু বহুকাল লেখার জন্যে কোনও কাগজ ছিল না। ভূর্জপত্র গাছের ছাল কিংবা তালপাতার উপর তারা লিখত। ইংরেজিতে ভূর্জপত্রকে 'বার্চ' (birch) বলে। এখনও তুমি কোনও কোনও লাইব্রেরিতে প্রাচীন কালে তালপাতার উপর লেখা পুঁথি দেখতে পাবে। তারপর কাগজ আবিষ্কার হলে লেখা অনেক সহজ হয়ে গেল। কিন্তু তখনও কোনও ছাপাখানা ছিল না, কাজেই এখনকার

মতো হাজার হাজার কপি বই ছাপানো যেত না। একটি বই কেবলমাত্র একবারই লেখা হত এবং তারপর অনেক কষ্ট করে হাতে লিখে তা নকল করা হত। স্বাভাবিক কারণেই এরকম হাতে-লেখা বইয়ের সংখ্যা বেশি থাকার কথা নয়। বই কেনার ইচ্ছা হলে তুমি কোনও বইয়ের দোকানে গিয়ে তা কিনতে পারতে না। কাউকে দিয়ে তোমাকে বইটি নকল করাতে হত এবং তা করতে অনেক সময় লাগত। তখনকার মানুষের হাতের লেখা ছিল খুব সুন্দর। এখনও অনেক লাইব্রেরিতে অতি সুন্দর হাতে-লেখা অনেক পুঁথি আছে। বিশেষ করে সংস্কৃত, ফারসি এবং উর্দুতে লেখা এরকম পুঁথি ভারতে আছে। যারা এগুলি নকল করত তারা পুঁথির পাতার চারপাশে ফুল এবং নানা ধরনের নক্‌শাও আঁকত।

নগরের সংখ্যা বাড়তে থাকে, তারপর ধীরে ধীরে বিভিন্ন দেশ ও জাতি গড়ে ওঠে। কোনও একটি দেশে যে সব মানুষ কাছাকাছি বাস করত স্বভাবতই তারা পরস্পরকে ভালভাবে জানত। ভাবত অন্য দেশের লোকের চেয়ে তারা অনেক ভাল আছে এবং নির্বোধের মতো সে সব দেশের মানুষের সঙ্গে তারা লড়াই করত। তারা বুঝতে পারেনি যে পরস্পরের মধ্যে লড়াই করা ও একে অন্যকে হত্যা করার মতো বোকামির কাজ মানুষের পক্ষে আর কিছু নেই। এ কথা এখনও অনেকে বুঝতে পারে না। এতে কারও ভাল হয় না।

প্রাচীন কালের নগর এবং রাজ্যের কথা কখনও কখনও আমরা পুরনো বই পড়ে জানতে পারি। কিন্তু এরকম বই খুব বেশি নেই। তবে অন্য অনেক জিনিস সে কথা আমাদের জানতে সাহায্য করে। সেকালের রাজা ও সম্রাটেরা তাঁদের রাজত্বকালের বিবরণ পাথরের ফলক এবং স্তম্ভের উপর লিখে রাখার ব্যবস্থা করতেন। বই বেশি দিন টেকে না। কাগজ নষ্ট হয়ে যায়, তা পোকায় কাটে। কিন্তু পাথর আরও অনেক বেশি দিন টিকে থাকে। এলাহাবাদ দুর্গে অশোকের যে শিলাস্তম্ভ দেখেছিলে সে কথা তোমার হয়তো মনে পড়বে। এর গায়ে কয়েক শো বছর আগেকার ভারতের মহান সম্রাট অশোকের অনুশাসন খোদাই করা আছে। লখনৌ মিউজিয়ামে গেলে তুমি এমন অনেক পাথরের ফলক দেখতে পাবে, যার গায়ে অনেক কথা খোদাই করা আছে।

বিভিন্ন দেশের প্রাচীন ইতিহাস পড়লে আমরা জানতে পারব যখন ইউরোপের মানুষ ছিল বর্বর সেই সময় চিন ও মিশরে কত বিরাট এবং মহান ব্যাপার ঘটেছিল। আমরা আরও জানতে পারব ভারতের মহান অতীতের কথা, যখন রামায়ণ ও মহাভারত লেখা হয়েছিল এবং ভারত ছিল এক সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী দেশ।

AMARBOI.COM

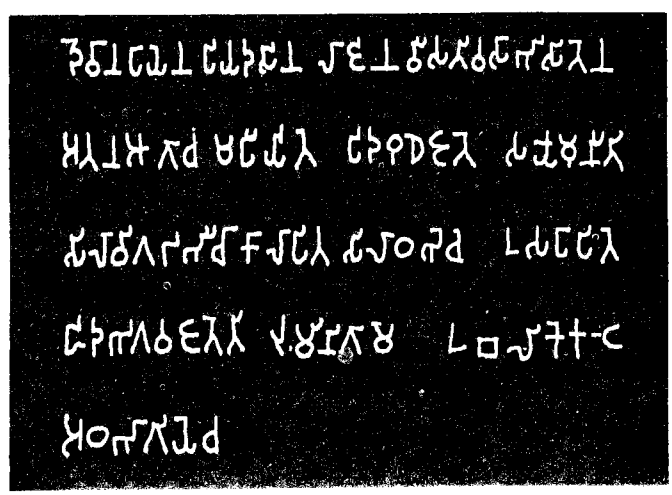

লুম্বিনি থেকে পাওয়া একটি প্রস্তরলিপি

এখন আমাদের দেশ খুব গরিব, এক বিদেশি জাতি আমাদের শাসন করে। নিজেদের দেশেই আমরা স্বাধীন নই এবং নিজেদের ইচ্ছামতো কোনও কাজ করতে পারি না। কিন্তু এক সময় এরকম ছিল না। কঠোরভাবে চেষ্টা করলে আমরা নিজের দেশকে আবার স্বাধীন করতে পারি। তখন গরিবের জীবনকে আরও উন্নত করতে এবং এখনকার দিনের ইউরোপের কয়েকটি দেশের মতো ভারতকেও সুন্দর দেশে পরিণত করতে পারব। পরের চিঠিতে একেবারে আদি কাল থেকে পৃথিবীর চিত্তাকর্ষক ইতিহাসের কাহিনী বলতে শুরু করব।

কীভাবে পৃথিবীর সৃষ্টি হল

তুমি জানো, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে এবং চাঁদ ঘোরে পৃথিবীর চারদিকে। তুমি হয়তো এও জানো যে আরও কয়েকটি বস্তুপুঞ্জ আছে যা পৃথিবীর মতো সূর্যের চারদিকে ঘোরে। আমাদের পৃথিবীসুদ্ধ এগুলিকে সূর্যের গ্রহ বলা হয়। চাঁদকে পৃথিবীর উপগ্রহ বলা হয় কারণ পৃথিবীর আকর্ষণে তা চলছে। অন্য গ্রহদেরও নিজ নিজ উপগ্রহ আছে। সূর্য এবং উপগ্রহসহ অন্যান্য গ্রহ মিলে একটি সুখী পরিবার। একে বলা হয় সৌরজগৎ। সূর্যের সঙ্গে সম্পর্কিত সবকিছুকে সৌর বলা হয়। যেহেতু সূর্য সমস্ত গ্রহের জনক সেজন্যে পুরো মণ্ডলীকে সৌরজগৎ বলা হয়।

রাত্রে আকাশে তুমি হাজার হাজার নক্ষত্র দেখতে পাও। এদের মধ্যে মাত্র অল্প কয়েকটি হল গ্রহ, এগুলিকে আদৌ নক্ষত্র বলা হয় না। গ্রহের সঙ্গে নক্ষত্রের তফাত কি তুমি করতে পারো? নক্ষত্রের তুলনায় গ্রহ হল আসলে খুব ছোট, যেমন আমাদের পৃথিবী। কিন্তু গ্রহগুলি আমাদের খুব কাছে আছে, সেজন্যে আকাশে তাদের বড় দেখায়। আকারে অনেক ছোট হলেও চাঁদকে এত বড় দেখায় কারণ তা আমাদের খুব কাছে আছে। কিন্তু গ্রহ থেকে নক্ষত্রকে পৃথক করার প্রকৃত উপায় হল তা মিটমিট করে কি না লক্ষ্য করা। নক্ষত্র মিটমিট করে, গ্রহ তা করে না। এর কারণ হল সূর্য থেকে আলো পেয়ে থাকে বলেই গ্রহকে উজ্জ্বল দেখায়। গ্রহ বা চাঁদের উপর সূর্যরশ্মির প্রতিফলনই কেবল আমরা দেখতে পাই। আসল নক্ষত্র হল সূর্যের মতোই। তারা নিজে থেকেই জ্বলজ্বল করে কারণ তারা অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং জ্বলন্ত বস্তু। বস্তুত আমাদের সূর্য নিজে একটি নক্ষত্র। আমাদের কাছে থাকার জন্যে তাকে কেবল বড় দেখায়। আমাদের চোখে সূর্য একটি বড় আগুনের গোলার মতো।

আমাদের পৃথিবী সূর্যের পরিবারমণ্ডলী অর্থাৎ সৌরজগতের অন্তর্ভুক্ত। আমরা মনে করি পৃথিবীটা খুব বড় এবং আমাদের মতো ছোটখাট মানুষের তুলনায় পৃথিবী অনেক বড়। পৃথিবীর এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে হলে, দ্রুতগামী ট্রেন বা স্টিমারে গেলেও, কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস কেটে যায়। আমাদের কাছে তা এত বড় মনে হলেও আসলে পৃথিবীটা হল যেন বাতাসে ভেসে বেড়ানো একটি ধূলিকণার মতো। সূর্য লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে আছে এবং এমনকী অন্যান্য নক্ষত্র আছে আরও দূরে।

AMARBOI.COM

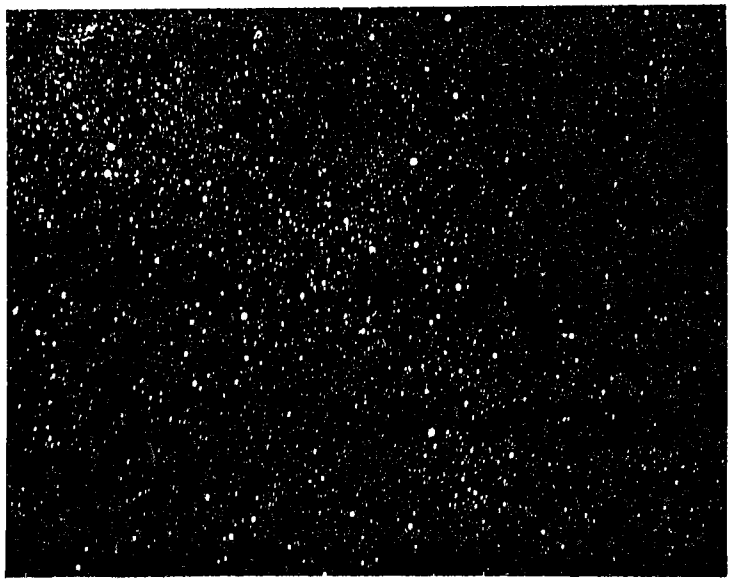

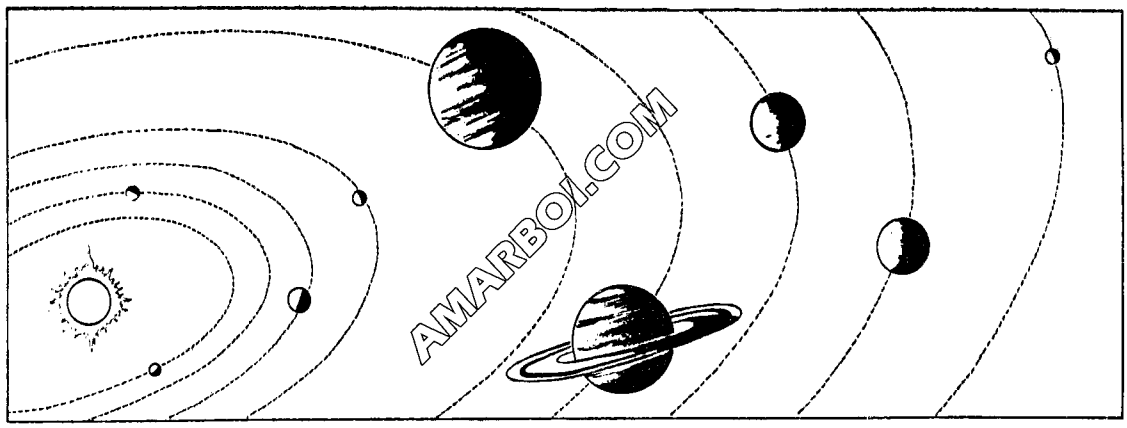

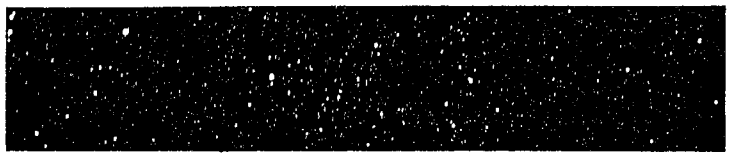

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা, যাঁরা নক্ষত্র নিয়ে গবেষণা করেন, আমাদের বলেছেন যে বহু কাল আগে পৃথিবী ও অন্য সব গ্রহ ছিল সূর্যেরই অংশ। সূর্য তখন ছিল এখনকার মতোই এক জ্বলন্ত বস্তুপুঞ্জ, ভয়ানক উত্তপ্ত। সূর্যের অল্প কিছু অংশ কোনওভাবে আলগা হয়ে বায়ুমণ্ডলে সবেগে ছিটকে পড়ে। এই অংশগুলি কিন্তু তাদের জনক সূর্যের কাছ থেকে একেবারে মুক্তি পায়নি। যেন একটি দড়ি দিয়ে তাদের বেঁধে রাখা হয়েছে এবং তারা সূর্যের চারদিকে ঘুরতেই থাকে। এই যে অজানা শক্তি, যাকে আমি দড়ির সঙ্গে তুলনা করেছি, তা এমনই এক শক্তি যা ছোট ছোট বস্তুকে বৃহৎ বস্তুর দিকে আকর্ষণ করে। এই হল সেই শক্তি যার দরুন কোনও বস্তু নিজের ভারে নীচের দিকে নেমে আসে। আমাদের কাছাকাছি যে সব বস্তু আছে তার মধ্যে

পৃথিবী সবচেয়ে বড়। তাই পৃথিবীর কাছাকাছি যে সকল বস্তু আছে তাদের সকলকে সে আকর্ষণ করে।

এইভাবে আমাদের পৃথিবীও সূর্য থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল। তখন নিশ্চয়ই তা ছিল খুব উত্তপ্ত, তার চারপাশে ছিল ভয়ঙ্কর উত্তপ্ত নানা গ্যাস এবং বাতাস। কিন্তু আকারে সূর্যের তুলনায় অনেক ছোট হওয়ায় পৃথিবী ঠাণ্ডা হতে শুরু করে। সূর্যের উত্তাপও কমে আসছে, কিন্তু তা একেবারে ঠাণ্ডা হতে লক্ষ লক্ষ বছর সময় লাগবে। ঠাণ্ডা হতে পৃথিবীর সময় লেগেছিল অনেক কম। পৃথিবী যখন উত্তপ্ত ছিল তখন এখানে কোনও কিছুরই—মানুষ, জীবজন্তু, গুল্ম বা গাছ—বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল না। কিছু থাকলে ভয়ঙ্কর উত্তাপে তা পুড়ে ছাই হয়ে যেত।

সূর্যের একটা অংশ যেমন ছিটকে এসে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়, তেমনি পৃথিবীর এক অংশ ছিটকে গিয়ে চাঁদের জন্ম হয়। পৃথিবীর যে বিরাট অংশ থেকে চাঁদ বেরিয়ে এসেছিল, অনেকের মতে সেই অংশ হল এখন আমেরিকা ও জাপানের মধ্যেকার প্রশান্ত মহাসাগর।

পৃথিবী ঠাণ্ডা হতে শুরু করল। সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা হতে দীর্ঘ সময় লাগল। ধীরে ধীরে পৃথিবীর বাইরের দিকটা ঠাণ্ডা হয়ে এল যদিও ভিতরের দিকটা রইল উত্তপ্ত। এখনও যদি তুমি কোনও কয়লাখনির ভিতরে নামো, যতই নীচে নামবে ততই বোধ করবে তাপ বাড়ছে। যদি তুমি পৃথিবীর ভিতরের দিকে বেশ কিছুদূর নেমে যাও, দেখবে তা গনগনে লাল আগুনের মতো উত্তপ্ত। চাঁদও ঠাণ্ডা হতে শুরু করে। আকারে পৃথিবীর চেয়ে ক্ষুদ্র হওয়ায় চাঁদ পৃথিবীর তুলনায় অল্প সময়ের মধ্যে ঠাণ্ডা হয়ে আসে। চাঁদ দেখতে বড় আরামদায়ক ঠাণ্ডা জায়গা; নয় কি? চাঁদকে বলা হয় 'ঠাণ্ডা চাঁদ'। বোধ হয় চাঁদ অনেক হিমবাহ এবং বরফ-ঢাকা জায়গায় ভর্তি।

পৃথিবী যখন ঠাণ্ডা হয়ে এল, বায়ুমণ্ডলে যে জলীয় বাষ্প ছিল তা ঘনীভূত হয়ে জলকণায় পরিণত হয় এবং তারাই সম্ভবত বৃষ্টির আকারে নীচে নেমে আসে। সে সময় নিশ্চয়ই প্রবল বৃষ্টি হয়েছিল। এই বৃষ্টিধারায় পৃথিবীর বড় বড় গহ্বরগুলি ভর্তি হয়ে যায় এবং এভাবে সাগর ও মহাসাগরের সৃষ্টি হয়।

পৃথিবী ক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে এল এবং মহাসাগরও ঠাণ্ডা হয়ে এল। তখন পৃথিবীর উপরিভাগে বা সাগরের মধ্যে কোনও প্রাণীর পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব হল। পরের চিঠিতে প্রথমে কীভাবে প্রাণের সূচনা হয়েছিল সে কথা বলব।

AMARBOI.COM

প্রথম প্রাণের সূচনা

আগের চিঠিতে আমরা দেখেছি পৃথিবী বহুকাল এমন উত্তপ্ত ছিল যে এখানে কোনও প্রাণীর বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল না। পৃথিবীতে কখন প্রাণের সূচনা হল এবং প্রথম জীবন্ত প্রাণী কী? এ প্রশ্নটি আমাদের কৌতূহল জাগায় কিন্তু এর উত্তর দেওয়াটা খুব কঠিন। প্রথমে বিচার করে দেখা যাক, প্রাণ বলতে কী বোঝায়। তুমি হয়তো বলবে মানুষ হল জীবন্ত প্রাণী এবং অন্যান্য জীবজন্তুরাও তাই। গাছ, লতাগুল্ম, শাকসবজি এবং ফুলকে কী বলবে? নিশ্চয়ই তাদেরও প্রাণ আছে। তাদের চেহারা বাড়ে, তারা জল পান করে, বাতাসে নিঃশ্বাস নেয় এবং একসময় মরে যায়। গাছ এবং প্রাণীর মধ্যে প্রধান তফাত হল, গাছ চলাফেরা করতে পারে না। তোমার মনে পড়বে যে লন্ডনের কিউ গার্ডেনস-এ আমি তোমাকে কয়েকটি গাছ দেখিয়েছিলাম। এইসব গাছ—অর্কিড এবং কলসির আকারের পাতা ভর্তি গাছ—আসলে পতঙ্গ ধরে খায়। এ ছাড়া কয়েক রকমের প্রাণী আছে, যেমন স্পঞ্জ, যারা সমুদ্রের তলায় থাকে এবং ঘোরাঘুরি করতে পারে না। কোনও বস্তু প্রাণী না গাছ, তা বলা কখনও কখনও কঠিন। যখন তুমি উদ্ভিদবিজ্ঞান পড়বে তখন দেখবে এমন কতকগুলি অদ্ভুত বস্তু আছে যা পুরোপুরি প্রাণীও নয়, গাছও নয়।

কেউ কেউ বলছেন পাহাড়-পর্বতেরও এক ধরনের প্রাণ আছে এবং এরা ব্যথা অনুভব করে থাকে। কিন্তু তা বাইরে থেকে বোঝা শক্ত। তোমার হয়তো এক ভদ্রলোককে মনে পড়বে, যিনি জেনিভায় আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তাঁর নাম স্যার জগদীশচন্দ্র বসু। তিনি পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে গাছের প্রাণ আছে। এমনকী তিনি এ-ও মনে করেন যে পাথরেরও প্রাণ আছে।

কাজেই বুঝতে পারছ কোন্ জিনিসের প্রাণ আছে আর কার নেই তা বলা সহজ নয়। এখন পাথরের কথা বাদ দিয়ে গাছপালা ও প্রাণীর কথা ভেবে দেখা যাক। পৃথিবীতে নানা ধরনের অসংখ্য জীবন্ত প্রাণী আছে। এদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ দুই-ই আছে। তাদের মধ্যে কেউ চালাক, কেউ বা বোকা। এরপর আছে জন্তু-জানোয়ার; তাদের মধ্যেও তুমি দেখবে হাতি, বানর বা পিঁপড়ের মতো চালাক প্রাণী, কেউ বা আবার অতি বোকা। প্রাণের আবির্ভাবের ক্রম হিসাবে মাছ এবং আরও বহু সমুদ্রের জীব অনেক নীচের স্তরের। একেবারে শেষ ধাপে তুমি দেখতে পাবে স্পঞ্জ এবং জেলির মতো এক ধরনের মাছ, যা অর্ধেক প্রাণী, অর্ধেক মাছ।

এবার আমরা ভেবে দেখব এইসব বিভিন্ন ধরনের প্রাণী হঠাৎ একদিন একসঙ্গে জন্মেছিল, না ধীরে ধীরে একের পর এক তাদের জন্ম হয়েছিল। কীভাবে আমরা তা জানতে পারব? বই বলতে আসলে যা বোঝায় প্রাচীন কালে সে রকম কিছু ছিল না। প্রকৃতির রাজ্যে অনুসন্ধান আমাদের কি কোনও সাহায্য করতে পারে? নিশ্চয়ই পারে। প্রাচীন পাহাড়-পর্বতে প্রাণীদের হাড় আমরা খুঁজে পেয়েছি। এগুলিকে বলা হয় ফসিল। বলতে পারি, ফসিলে যে সব প্রাণীর হাড় আমরা দেখতে পাই তারা নিশ্চয়ই হাজার হাজার বছর আগে যখন পাহাড়ের জন্ম হচ্ছিল তখন বেঁচে ছিল। এ ধরনের ছোট-বড় অনেক ফসিল তুমি লন্ডনের কেনসিংটন মিউজিয়ামে দেখেছ।

কোনও প্রাণী মারা গেলে তার দেহের নরম ও মাংসল অংশটা শীগ্‌গির নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু তার হাড় বহু

কাল অটুট থাকে। এই হাড়গুলিই আমরা খুঁজে পেয়েছি এবং এগুলি পরীক্ষা করে অতীত কালের জীবজন্তুদের বিষয়ে অনেক কথা আমরা জানতে পারি। কিন্তু মনে করো, কোনও প্রাণীর দেহে হাড় ছিল না, এখনকার জেলিমাছের মতো। মৃত্যুর পর এইসব প্রাণীর কোনও চিহ্নই তো তাহলে থাকত না।

পাহাড় পর্বতে ভালভাবে খুঁজে পুরনো ফসিল সংগ্রহ করে পরীক্ষা করলে জানা যায় যে বিভিন্ন ধরনের প্রাণী বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীতে বাস করত। হঠাৎ তারা কোনও শূন্য থেকে পৃথিবীতে আসেনি। সবার আগে এসেছিল শারীরিক গঠনের দিক থেকে সরল, খোলায়-ঢাকা কয়েকটি প্রাণী, যেমন শামুক, কাঁকড়া। সমুদ্রের তীরে তুমি যে সুন্দর ঝিনুক কুড়িয়ে থাকো আসলে সেগুলি হল মরা প্রাণীর শক্ত খোলা। এরপর আমরা

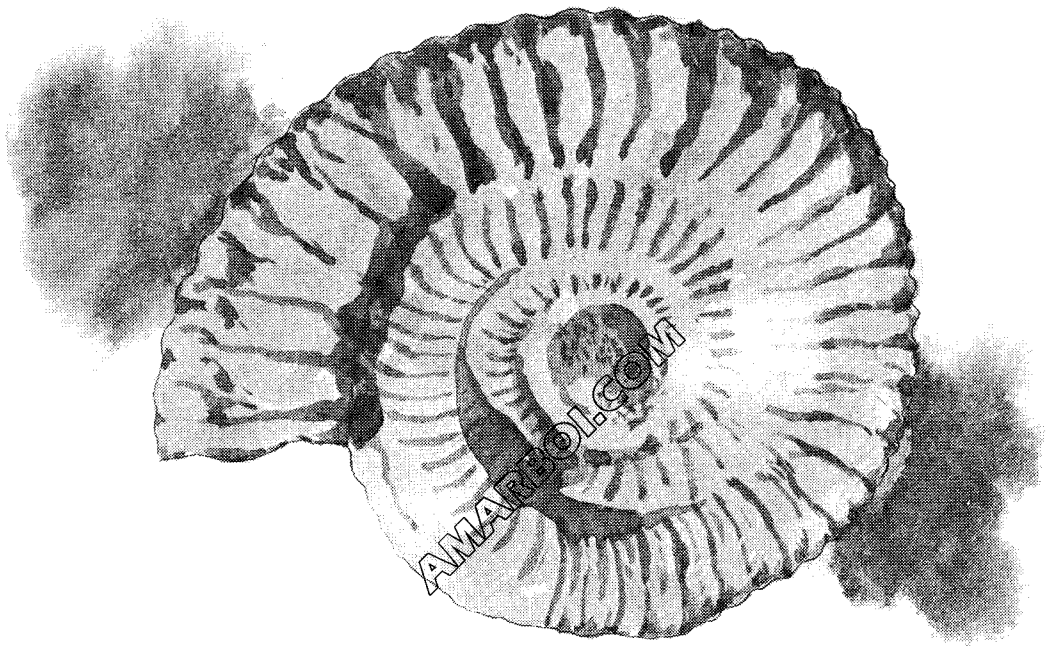
AMARBOI.COM

দেখতে পাই সাপের মতো জটিল প্রাণী, হাতির চেয়েও বড় চেহারার জন্তু, পাখি এবং অন্যান্য জীবজন্তু যাদের সঙ্গে বর্তমান কালের জীবজন্তুদের খুব মিল আছে। সবশেষে দেখতে পাওয়া গেছে মানুষের দেহাবশেষ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যেন বিকাশের একটি ক্রম অনুসারে প্রাণীদের আবির্ভাব ঘটেছে। প্রথমে আসে অতি সাধারণ প্রাণী, তারপর আরও একটু উঁচু জাতের প্রাণী। জটিল থেকে জটিলতর বিবর্তনের পথ বেয়ে সব শেষে এল মানুষ—জীবজগতের সবচেয়ে উঁচু স্তরের প্রাণী। নগণ্য স্পঞ্জ এবং শামুক কাঁকড়া ধরনের খোলা-ঢাকা প্রাণী কীভাবে নিজেদের রূপান্তর ঘটিয়ে উন্নতি করেছিল, সে কাহিনী খুব কৌতূহলের। একদিন তোমাকে সে কথা বলব। কিন্তু এখন আমরা আলোচনা করব পৃথিবীর প্রথম প্রাণী কাদের বলা হয়।

পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়ে আসার পর প্রথম প্রাণী হিসেবে দেখা দেয় জেলির মতো এক ধরনের প্রাণী, যার কোনও খোলা বা হাড় ছিল না এবং যারা বাস করত সমুদ্রে। খোলা বা হাড় না থাকার জন্যে এদের কোনও ফসিল পাওয়া যায়নি। এদের বিষয়ে আমাদের কম-বেশি অনুমানের উপর নির্ভর করতে হবে। এখনও

সমুদ্রে এরকম জেলির মতো দেখতে অনেক প্রাণী আছে। তাদের আকার গোল, কিন্তু কোনও হাড় বা খোলা না থাকায় আকার কেবলই বদলে যাচ্ছে। এদের অনেকটা এইরকম দেখতে—

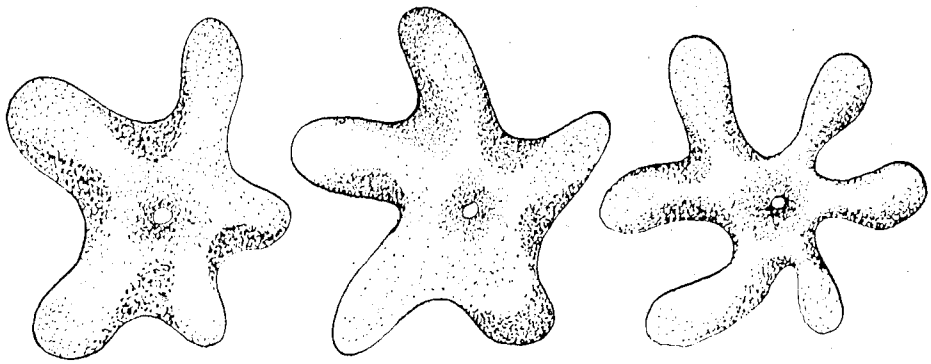

ছবির ঠিক মাঝখানে একটি চিহ্ন দেখতে পাবে। একে বলা হয় কেন্দ্রবিন্দু (নিউক্লিয়াস) এবং এ হল হৃদ্‌পিণ্ডের মতো। এইসব প্রাণী, অথবা তাদের যা-ই বলা হোক না কেন, এক অদ্ভুত উপায়ে নিজেদের ভাগ করে দুটি খণ্ড হয়ে যায়। এরা নিজেদের শরীরের এক অংশকে ক্রমশ সরু করতে থাকে। এভাবে সরু হতে হতে শেষ পর্যন্ত তারা দুটি জেলির মতো অংশে ভাগ হয়ে যায় এবং এ দুটি অংশের আকার ঠিক মূল প্রাণীটিরই মতো। এইভাবেই ভাগটা হয়ে থাকে।

দেখতে পাচ্ছ মাঝের কেন্দ্রবিন্দু বা হৃদ্‌পিণ্ডটি দু ভাগ হয়ে গেছে। প্রত্যেকটি অংশ এর কিছুটা করে

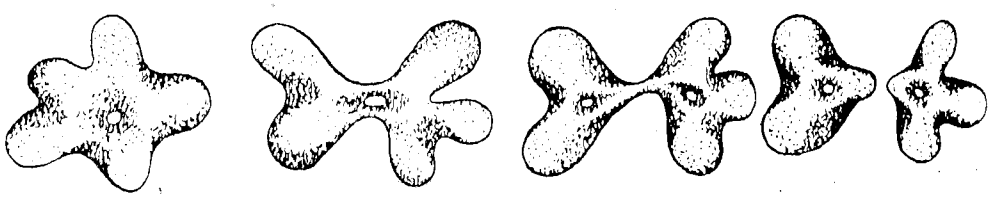

পেয়েছে। এভাবে এ ধরনের প্রাণীরা নিজেদের ভাগ করতে করতে সংখ্যা বৃদ্ধি করে চলে।

এই জেলির মতো কোনও কিছু নিশ্চয়ই পৃথিবীর প্রথম প্রাণী। জীবনের প্রকাশ ছিল কী সহজ ও সাধারণ। তখন পৃথিবীতে এর চেয়ে ভাল বা উন্নতমানের কোনও প্রাণী ছিল না। প্রকৃত প্রাণীর আবির্ভাব

তখনও ঘটেনি। আরও লক্ষ লক্ষ বছর পার হওয়ার পর এসেছে মানুষ।

এই জেলির মতো বস্তুর পরে এসেছে সমুদ্রের শ্যাওলা, খোলাওয়ালা শামুক, ঝিনুক, কাঁকড়া এবং পোকামাকড়। তারপর জন্মেছে মাছ। মাছের শরীরে ছিল শক্ত কাঁটা বা খোলা। কবে তারা মরে গেছে, আজও মাছের শরীরের এ অংশগুলি খুঁজে পাওয়া যায়। এগুলি নিয়ে গবেষণা করে মাছের সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু জানতে পেরেছি। সমুদ্রের নীচে কাদার মধ্যে এই খোলাগুলি পড়ে ছিল। পরে কাদা ও মাটিতে সেগুলি চাপা পড়ে যায় এবং এজন্যেই সেগুলি ভালভাবে রক্ষা পায়। উপরের কাদা ও বালির ভারে ও চাপে নীচের কাদা শক্ত হয়ে যায়। শক্ত হয়ে একেবারে পাথর হয়ে দাঁড়ায়। এইভাবে সমুদ্রের তলায় পাহাড়ের সৃষ্টি হয়। ভূমিকম্প বা অন্য কোনও বিপর্যয়ে একদিন ওই পাহাড় জলের নীচে থেকে উপরে উঠে আসে এবং তা শক্ত ভূমিতে পরিণত হয়। নদীর স্রোতে এবং বৃষ্টিতে সেই পাহাড় ক্রমাগত ধুয়ে যাওয়ার পরে প্রাণীদেহের যে খোলাগুলি এর ভিতর যুগ যুগ ধরে লুকিয়ে ছিল, তা বেরিয়ে আসে। এইভাবেই আমরা প্রাচীন প্রাণীর খোল বা ফসিলের সন্ধান পাই এবং সেগুলি নিয়ে গবেষণা করে মানুষের আবির্ভাবের পূর্বে পৃথিবী কেমন ছিল তা জানতে পারি।

সাধারণ প্রাণী কীভাবে উন্নতি করতে করতে আজকের চেহারায় এসেছে সে কথা পরের চিঠিতে বলব।

AMARBOI.COM

জীবজন্তুর আবির্ভাব

আমরা দেখেছি পৃথিবীতে প্রাণের প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল বোধ হয় অতি সাধারণ সমুদ্রের জীব এবং জলজ গাছের মধ্যে। এরা কেবল জলের মধ্যে বেঁচে থাকতে পারত। জল থেকে বাইরে এলে শুকিয়ে মরে যেত, এখন যেমন জেলিমাছ সমুদ্রে আটকে পড়ে শুকিয়ে মরে যায়। এখন পৃথিবীতে যে পরিমাণে জল এবং জলাভূমি আছে সে তুলনায় অতীত কালে এইসবের পরিমাণ ছিল অনেক বেশি। জেলিমাছ এবং অন্যান্য সমুদ্রের প্রাণী যাদের চামড়া ছিল কিছুটা শক্ত তারা অন্য প্রাণীদের চেয়ে শুকনো ডাঙায় বেশিক্ষণ বেঁচে থাকতে পারত, কারণ তারা তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যেত না। ধীরে ধীরে নরম জেলিমাছ এবং ওই ধরনের অন্য প্রাণীর সংখ্যা কমতে থাকে কারণ তারা শুকনো ডাঙায় সহজে বেঁচে থাকতে পারত না। এবং যে সব প্রাণীর দেহের চামড়া ছিল শক্ত তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এই ব্যাপারটি বিশেষ করে লক্ষ্য করার মতো। এর অর্থ হল প্রাণীরা ধীরে ধীরে নিজেদের বেঁচে থাকার উপযুক্ত করে তোলে কিংবা পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে থাকে। লণ্ডনের সাউথ কেনসিংটন মিউজিয়ামে তুমি দেখেছ শীতকালে এবং

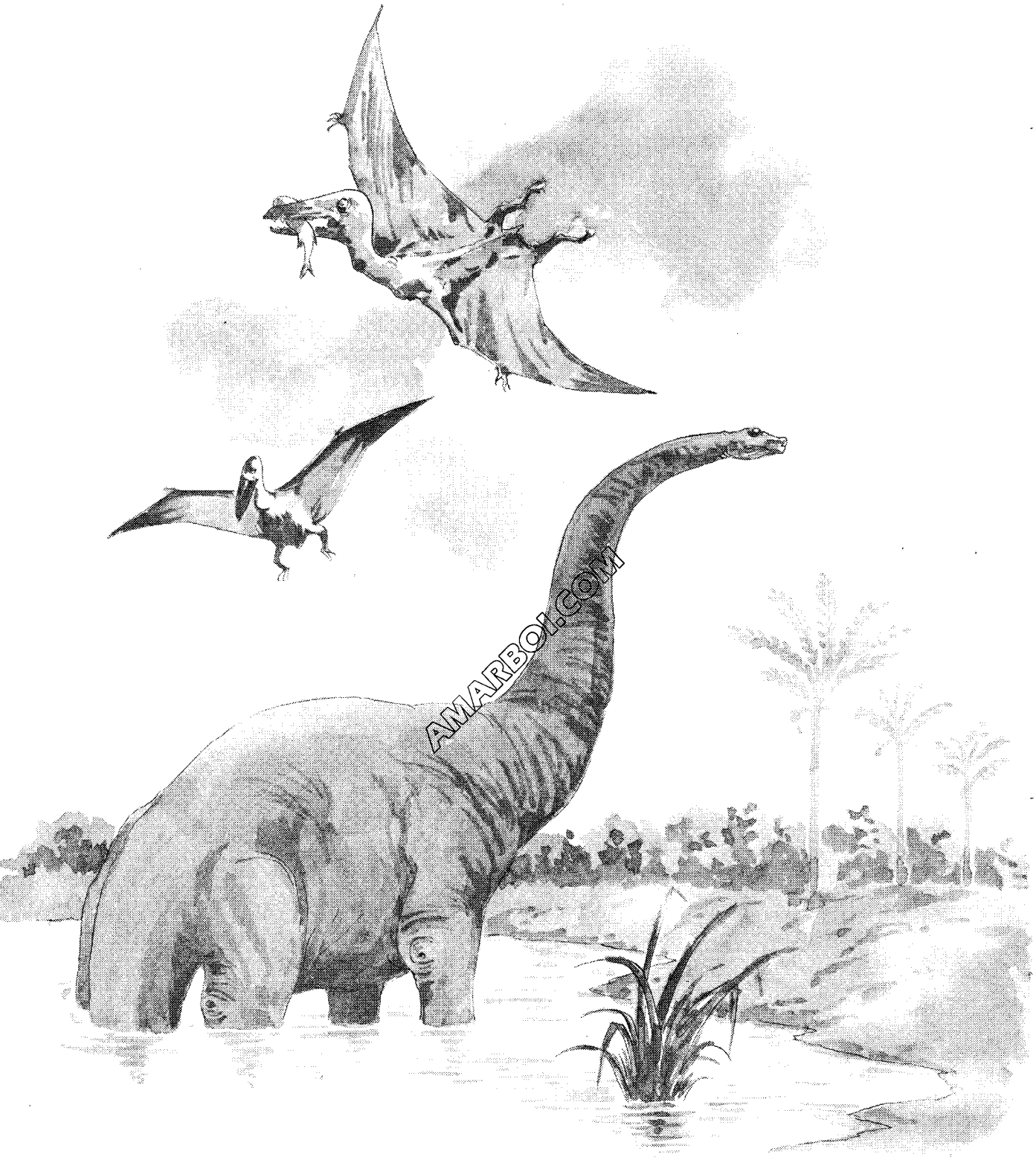

AMARBOL.COM

ARTAREON.COM

শীতপ্রধান দেশে যেখানে খুব বরফ পড়ে সেখানে পশু-পাখিদের রং কেমন বরফের মতো সাদা হয়ে যায়। তেমনি গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যেখানে সবুজ শাকসবজি এবং গাছপালা রয়েছে, পশুপাখির রং হয় সবুজ কিংবা অন্য কোনও উজ্জ্বল বর্ণের, অর্থাৎ পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে তারা নিজেদের মানিয়ে নেয়। শত্রুর হাত থেকে নিজেদের বাঁচানোর জন্যে তারা রং বদল করে। কারণ চারপাশের রঙের সঙ্গে নিজেদের রং মিশিয়ে নিলে তাদের কেউ সহজে দেখতে পাবে না। শীতের দেশে ঠাণ্ডায় শরীর গরম রাখার জন্যে তাদের গায়ে আপনা থেকেই লোম জন্মায়। একারণেই বাঘের গায়ে হলুদ রং এবং ডোরাকাটা, দেখলে মনে হবে জঙ্গলের গাছপালার মধ্যে ঠিক যেন সূর্যের আলো এসে পড়েছে। ঘন জঙ্গলের মধ্যে বাঘকে দেখতে পাওয়া বেশ কঠিন।

পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে প্রাণীরা নিজেদের মানিয়ে নিতে চেষ্টা করে। এ ব্যাপারটি শুধু কৌতূহলজনক নয়, গুরুত্বপূর্ণও বটে। প্রাণীরা অবশ্য নিজের থেকে বদলাবার চেষ্টা করে না। তবে যারা পরিবর্তন ঘটিয়েছে এবং সেজন্যে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পেরেছে, তাদের পক্ষে বেঁচে থাকার সুযোগ অনেক বেশি। এজন্যে তারা সংখ্যায় বাড়তে থাকে কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে এরকম ঘটে না। এই ব্যাপারটি থেকে অনেক কিছু প্রমাণ হয়। প্রমাণ হয় যে, অতি সাধারণ প্রাণী ধীরে ধীরে উন্নতি করে উঁচু শ্রেণীর প্রাণীতে পরিণত হয় এবং হয়তো বা লক্ষ লক্ষ বছর পরে মানুষের পর্যায়ে এসে পৌঁছয়। আমাদের চারপাশে যে সব পরিবর্তন ঘটছে তা আমরা দেখতে পাই না কারণ এইসব ঘটে অত্যন্ত ধীরগতিতে এবং আমাদের আয়ুও কম। কিন্তু প্রকৃতি নিজের কাজ করেই চলে, রদবদলের মধ্য দিয়ে কাজটি আরও নিখুঁত করে তোলে। প্রকৃতির কাজ কখনই থেমে থাকে না।

তোমার মনে পড়বে, পৃথিবী ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা এবং শুষ্ক হচ্ছিল। ঠাণ্ডা হয়ে এলে জলবায়ু এবং আরও অনেক কিছুর পরিবর্তন ঘটে। পৃথিবীর রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীজগতেরও পরিবর্তন ঘটে এবং নতুন ধরনের জীবজন্তু দেখা দেয়। প্রথমে ছিল অতি সাধারণ সামুদ্রিক প্রাণী, তারপরে এল জটিল সামুদ্রিক প্রাণী। পরে যখন শুকনো ভূমির পরিমাণ বাড়ল তখন এমন সব প্রাণী দেখা গেল যারা জল ও স্থল দু' জায়গাতেই বাস করতে পারে। এইসব প্রাণী হল অনেকটা এখনকার কুমির বা ব্যাঙের মতো। এদের পর আসে এমন সব প্রাণী যারা কেবলমাত্র স্থলেই বাস করত এবং তারপরে আসে পাখি—যারা আকাশে উড়ে বেড়াত।

AMARBOI.COM

ব্যাঙের কথা আগে বলেছি। ব্যাঙ নিয়ে গবেষণা বেশ কৌতূহলজনক। এর ফলে জানা যায় জলচর প্রাণী কীভাবে ধীরে ধীরে স্থলচর প্রাণীতে পরিণত হয়েছে। ব্যাঙ প্রথমে ছিল মাছের মতো, পরে তা স্থলচর প্রাণী হয়ে ওঠে। অন্যান্য স্থলচর প্রাণীর মতো ব্যাঙ ফুসফুসের সাহায্যে নিশ্বাস নিয়ে থাকে।

পৃথিবীতে যখন প্রাণের সূচনা হয় তখন পৃথিবী জুড়ে ছিল বিশাল সব জঙ্গল। সব জায়গাতেই জলাভূমি আর গভীর জঙ্গল। এই জঙ্গল পরে এক সময় পাথর এবং মাটিতে চাপা পড়ে আস্তে আস্তে কয়লায় পরিণত হয়। তুমি জানো, মাটির অনেক নীচে খনি থেকে আমরা কয়লা পাই। আসলে কয়লাখনি হল সুদূর অতীতকালের গহন জঙ্গল।

প্রথম যুগের প্রাণীদের মধ্যে ছিল ভয়ঙ্কর বড় বড় সাপ, গিরগিটি এবং কুমির। এদের কোনও কোনওটি ছিল একশো ফুট লম্বা। একশো ফুট লম্বা একটি সাপ বা গিরগিটি কল্পনা করতে পারো! লণ্ডনের মিউজিয়ামে আমরা যে এইসব প্রাণীর ফসিল দেখেছিলাম সে কথা কি তোমার মনে পড়ছে?

পরে যে সব প্রাণীর আবির্ভাব হয় তারা দেখতে এখনকার প্রাণীদের মতোই। এদের বলা হয় স্তন্যপায়ী প্রাণী কারণ এরা সন্তানদের স্তন্যপান করায়। প্রথম দিকে এদের চেহারা ছিল এখনকার তুলনায় খুব বড়। যে স্তন্যপায়ী প্রাণীর সঙ্গে মানুষের চেহারার খুব মিল আছে তা হল বানর বা বনমানুষ। এজন্যে অনেকে

মনে করেন যে মানুষ হল বানরের বংশধর। এ থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে প্রতিটি প্রাণী নিজেকে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে ধীরে ধীরে মানিয়ে নিয়ে ক্রমেই উন্নত থেকে উন্নততর হয়েছিল। এইভাবেই প্রথম দিকে মানুষ ছিল

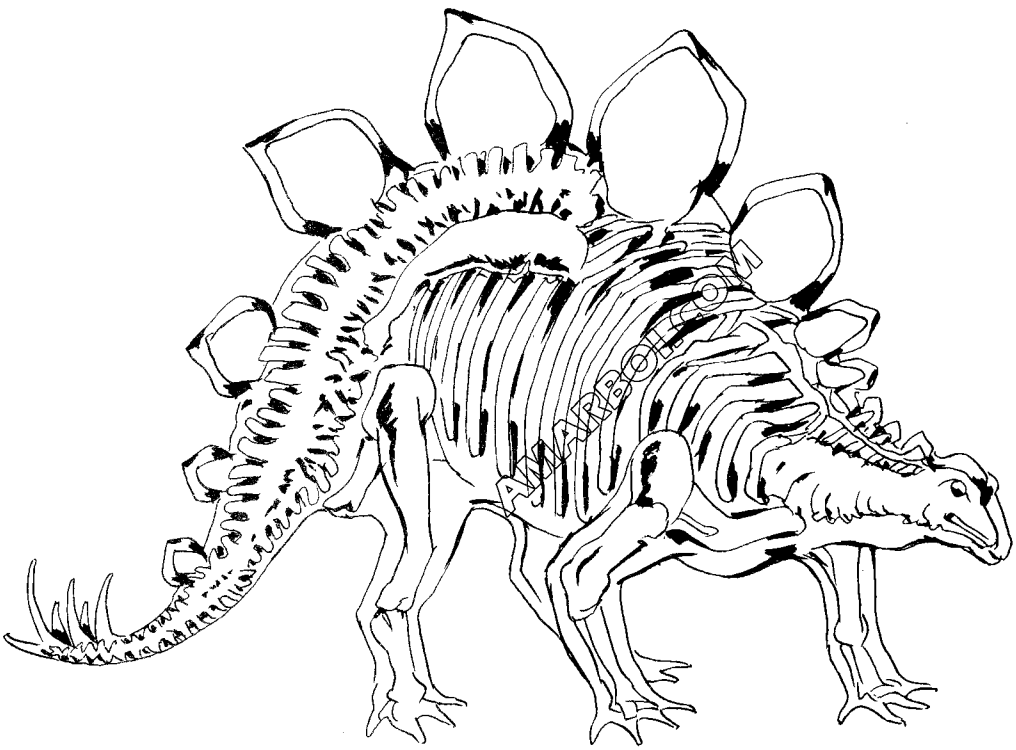

বিলুপ্ত স্টেগোসরাস প্রাণীর কঙ্কাল

এক উন্নতধরনের বানর মাত্র। মানুষ অবশ্য দিনে দিনে উন্নতি করতে থাকে কিংবা প্রকৃতি তাকে রূপান্তরিত হতে সাহায্য করেছিল। আজ মানুষ নিজের সীমা নিজেই জানে না। সে নিজেকে অন্য প্রাণীদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে। কিন্তু মনে রাখা ভাল যে আমরা বানরের বংশধর। বলতে দ্বিধা হয়, এখনও আমাদের মধ্যে অনেক মানুষ আছে যারা বানরের মতোই আচরণ করে থাকে।

মানুষের আবির্ভাব

আগের চিঠিতে আমরা দেখেছি পৃথিবীতে কীভাবে অতি সাধারণ রূপে প্রাণের শুরু হয়েছিল এবং ধীরে ধীরে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তা বর্তমানের আকার নিয়েছে। প্রাণের এই ক্রমবিকাশের ধারার মধ্যে আমরা আরও একটি কৌতূহলজনক এবং গুরুত্বপুর্ণ ব্যাপার লক্ষ্য করি। তা হল প্রাণীরা সব সময় পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে চেষ্টা করে এসেছে। তা করবার সময় তাদের নিজেদের অনেক নতুন গুণের বিকাশ ঘটেছে এবং তারা আরও উন্নত এবং জটিল এক প্রাণীতে পরিণত হয়েছে। নানাভাবে এই পরিবর্তন বা উন্নতি আমরা দেখতে পাই। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। প্রথমে প্রাণীদের দেহে কোনও হাড় ছিল না। কিন্তু হাড় না থাকলে বেশিদিন টিকে থাকা সম্ভব ছিল না বলে তাদের দেহে হাড় গজাল। শরীরে যে-হাড় প্রথমে গজাল সেটি হল শিরদাঁড়া। এইভাবে প্রাণীজগৎকে দুভাগে ভাগ করা যায়—হাড়ওলা প্রাণী, আর হাড়-ছাড়া প্রাণী। চারপাশে তুমি যে সব মানুষ ও জীবজন্তু দেখতে পাও তাদের সকলের শরীরে হাড় আছে।

এরপর আমরা দেখি মাছের মতো একটি তুচ্ছ প্রাণী যেরা ডিম পাড়ে এবং সেগুলি ফেলে রেখে চলে যায়। মাছ একবারে হাজার হাজার ডিম পাড়ে কিন্তু ডিমগুলির কোনও যত্ন করে না। মা নিজের সন্তানদের আদৌ দেখাশোনা করে না। মা কেবল ডিম পাড়ে, তাদের দিকে কখনও ফিরে তাকায় না। দেখাশোনা না করার জন্যে বেশির ভাগ ডিম নষ্ট হয়ে যায়, অতি অল্প ডিম ফুটে শেষ পর্যন্ত মাছ হয়। এটা কি ভয়ঙ্কর অপচয় নয়? আরও পরের যুগের বড় প্রাণীদের লক্ষ্য করলে দেখব যে তাদের ডিম বা সন্তানের সংখ্যা অনেক কম কিন্তু তারা সেগুলির খুব যত্ন নিয়ে থাকে।

মুরগিও ডিম পাড়ে এবং ডিমের ওপর বসে তা দিয়ে বাচ্চা ফুটোয়। ছোট্ট ছানা ফুটে বাচ্চা বের হলে মা বাচ্চাকে কিছুদিন খাওয়ায়। বাচ্চা বড় হলে মা আর তাদের বিশেষ যত্ন নেয় না।

তারপর স্তন্যপায়ীদের মতো উঁচুজাতের প্রাণীদের জীবনে বিরাট পরিবর্তন এসেছিল, সে বিষয়ে আগের চিঠিতে কিছু লিখেছি। এইসব প্রাণী ডিম পাড়ে না। মা নিজের শরীরের মধ্যে ভ্রূণ রেখে দেয় এবং কুকুর, বেড়াল বা খরগোশের মতো প্রাণী একেবারে পুরো চেহারার শাবকদের জন্ম দেয়। জন্মানোর পর শাবকদের মা স্তন্যপান করায় অর্থাৎ বুকের দুধ খাওয়ায়। এইভাবে মা সন্তানদের খুব যত্ন করে। এমনকী এক্ষেত্রেও বেশ অপচয় চোখে পড়ে। কয়েক মাস অন্তর খরগোশ অনেকগুলি করে বাচ্চার জন্ম দেয়, এদের মধ্যে অনেকগুলি মরে যায়। হাতির মতো উঁচু জাতের প্রাণী একবার কেবলমাত্র একটি শাবকের জন্ম দেয় এবং সন্তানকে যত্ন নিয়ে দেখাশোনা করে।

কাজেই তুমি দেখছ যে উঁচু জাতের প্রাণীরা ডিম পাড়ে না—বাচ্চা প্রসব করে। বাচ্চারা দেখতে বড় প্রাণীদেরই মতো, কেবল আকারে ছোট। উঁচু জাতের প্রাণীরা একবার মাত্র একটি সন্তানদের জন্ম দেয়।

আরও লক্ষ্য করে থাকবে যে এই প্রাণীরা নিজের সন্তানদের বেশ ভালবাসে। মানুষ হচ্ছে সবচেয়ে উন্নত প্রাণী। তুমি দেখবে বাবা-মা তাদের ছেলেমেয়েকে কী ভীষণ ভালবাসে এবং তাদের কত বেশি যত্ন করে।

এইভাবেই নিশ্চয় মানুষ একদিন নিচু স্তরের প্রাণী থেকে নিজেকে উন্নত করেছিল। যে মানুষকে আমরা এখন জানি তার সঙ্গে প্রথম যুগের মানুষের সম্ভবত খুব একটা মিল ছিল না। তখন মানুষ ছিল অর্ধেক মানুষ অর্ধেক বানর, দিনযাপন করত অনেকটা বানরের মতো। তোমার কি মনে পড়ছে জার্মানির হাইডেলবার্গে আমাদের সঙ্গে তুমি এক অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে। তিনি তাঁর ছোট মিউজিয়ামটি আমাদের দেখিয়েছিলেন। সেখানে অনেকগুলি ফসিল এবং বিশেষ করে একটি পুরনো মাথার খুলি রাখা ছিল। খুলিটি তিনি সাবধানে সিন্দুকের ভেতর তালাবন্ধ করে রেখেছিলেন। এটি সম্ভবত সবচেয়ে প্রাচীন কোনও মানুষের মাথার খুলি। হাইডেলবার্গের কাছে মাটির তলায় পাওয়া গিয়েছিল বলে এটিকে হাইডেলবার্গ মানুষের মাথার খুলি বলা হয়। সেই সময় অবশ্য হাইডেলবার্গ বা অন্য কোনও শহরের অস্তিত্ব ছিল না।

আদিম যুগে মানুষ যখন চারদিকে ঘুরে বেড়াত তখন পৃথিবী ছিল খুব ঠাণ্ডা জায়গা। সেই যুগকে বলা হয় তুষার যুগ, কারণ প্রায় সব জায়গা ছিল তুষারে ঢাকা। এখন যেমন উত্তরমেরু অঞ্চলে হিমবাহ দেখা যায়, সে সময় হিমবাহ একেবারে ইংল্যাণ্ড ও জার্মানি পর্যন্ত নেমে এসেছিল। মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা ছিল খুব কষ্টকর। যেখানে বরফ নেই শুধু সে রকম জায়গায় মানুষ বসবাস করত। বিজ্ঞানীরা বলেছেন তখন ভূমধ্যসাগরের কোনও অস্তিত্ব ছিল না, সে জায়গায় ছিল একটি বা দুটি হ্রদ। লোহিত সাগরও ছিল না, সবটাই ছিল ডাঙা। ভারতের বেশিরভাগ জায়গা ছিল সম্ভবত একটি দ্বীপ। পঞ্জাব এবং আমাদের প্রদেশগুলির এক অংশ জুড়ে ছিল সমুদ্র। কল্পনা করে দেখ, দক্ষিণ ভারত ও মধ্য ভারত মিলে ছিল একটি বড় দ্বীপ। এই দ্বীপ আর হিমালয়ের মাঝে ছিল সমুদ্র। সে সময় মুসৌরী যেতে হলে কিছুটা পথ তোমাকে স্টিমারে যেতে হত।

মানুষের যখন আবির্ভাব হল তার চারদিকে ছিল বিশাল চেহারার নানা জীবজন্তু। কাজেই মানুষকে তাদের ভয়ে দিন কাটাতে হত। আজ মানুষ জগতের প্রভু, নিজের ইচ্ছেমতো সে অন্য জীবজন্তুদের চালায়। ঘোড়া, গোরু, হাতি, কুকুর, বেড়াল এবং আরও অনেক প্রাণীকে সে পোষ মানিয়েছে। কতকগুলি প্রাণীর মাংস সে আহার করে; সিংহ আর বাঘের মতো কয়েকটি প্রাণীকে শিকার করে তার আনন্দ হয়। কিন্তু যখন সে এইসব প্রাণীর প্রভু ছিল না, বরং তাদের কাছে সে নিজেই ছিল শিকারের এক অসহায় লক্ষ্যবস্তু, তখন সে ভয়ঙ্কর প্রাণীদের কাছ থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করত। ধীরে ধীরে মানুষ অবশ্য মাথা তুলে দাঁড়াল, শক্তি সঞ্চয় করল এবং একসময় অন্য প্রাণীদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠল। কীভাবে সে তা করেছিল? গায়ের জোরে নয়, কারণ হাতির শক্তি মানুষের চেয়ে অনেক বেশি। এটা সম্ভব হয়েছিল মানুষের বুদ্ধি বা মস্তিষ্কের জোরে।

আদিম যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত মানুষের বুদ্ধির বিকাশের ধারা আমরা অনুসরণ করতে পারি। আসলে বুদ্ধিই মানুষকে অন্য প্রাণীদের থেকে পৃথক করে দিয়েছে। বুদ্ধিহীন মানুষের সঙ্গে একটি জন্তুর আসলে কোনও তফাত নেই।

মানুষের প্রথম বড় আবিষ্কার হল আগুন জ্বালাতে শেখা। এখন আমরা দেশলাই দিয়ে আগুন জ্বালি, কিন্তু দেশলাই তো এখনকার জিনিস। প্রাচীন যুগে দুটি চকমকি পাথর ঘষতে ঘষতে একসময় আগুনের ফুলকি বেরত। সেই ফুলকি থেকে খড় বা অন্য কোনও শুকনো জিনিসে আগুন ধরে যেত। কখনও কখনও চকমকি পাথর বা অন্য কিছুর ঠোকাঠুকিতে জঙ্গলে আপনা-আপনি আগুন জ্বলে উঠত। আগুন জ্বলা দেখে কোনও কিছু শেখার মতো বুদ্ধি জন্তুদের ছিল না। কিন্তু মানুষ ছিল আরও বুদ্ধিমান। সে আগুন ব্যবহারের সুবিধা বুঝতে পারল। আগুনের তাপে শীতকালে তারা ঠাণ্ডার হাত থেকে রক্ষা পেত এবং আগুন দেখে তাদের শত্রু বড় বড় জন্তুরা ভয় পেয়ে পালিয়ে যেত। সুতরাং একবার আগুন জ্বলে উঠলে মানুষ তার ওপর শুকনো

পাতা ফেলে তা জ্বালিয়ে রাখার চেষ্টা করত। আগুন যাতে নিভে না যায় সেই চেষ্টা তারা করত। পরে মানুষ দেখল যে সে নিজেই চকমকি পাথর পরস্পর ঘষে ফুলকি বার করতে পারে এবং তা থেকে আগুন জ্বালাতে পারে। মানুষের জীবনে এ এক বড় আবিষ্কার। আগুন জ্বালানোর কৌশল আয়ত্ত করায় সে অন্য প্রাণীদের উপর প্রভুত্ব করার শক্তি অর্জন করল। পৃথিবীতে প্রভুত্ব করার পথে মানুষ এগিয়ে চলল।

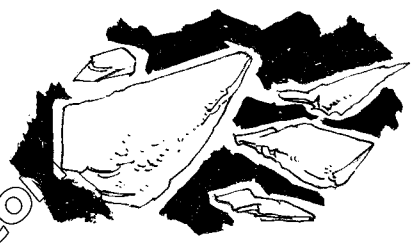

প্রথম যুগের মানুষ

AMARBOI.COM

আগের চিঠিতে আমরা দেখেছি মানুষ ও জন্তুর মধ্যে প্রধান পার্থক্য হচ্ছে মানুষের বুদ্ধি আছে। এই বুদ্ধির জন্যেই মানুষ অতিকায় জন্তুর চেয়ে বেশি চতুর ও শক্তিশালী। নইলে জন্তুরা মানুষকে বিনাশ করে দিত। বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শক্তিও বাড়তে থাকে। প্রথম যুগে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করার জন্যে মানুষের হাতে বিশেষ কোনও অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। সে কেবল শত্রুকে লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়ত। তারপর মানুষ পাথরের তৈরি কুঠার, বর্শা এবং আরও নানারকম অস্ত্র, এমনকী পাথরের সূক্ষ্ম ছুঁচ তৈরি করতে শিখল। সাউথ কেনসিংটন এবং জেনিভার মিউজিয়ামে আমরা এধরনের অনেক পাথরের অস্ত্রশস্ত্র দেখেছি।

আগের চিঠিতে যে তুষার যুগ সম্বন্ধে কিছু বলেছি ধীরে ধীরে তা শেষ হয়ে গেল। মধ্য ইউরোপ এবং এশিয়া থেকে হিমবাহ অদৃশ্য হয়ে গেল। তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

সে যুগে কোনও বাড়িঘর বা অট্টালিকা ছিল না। মানুষ গুহায় বাস করত। মানুষ তখন কৃষিকাজ অর্থাৎ জমিতে কাজ করতে জানত না। তারা শুধু ফল, বাদাম আর নিজেদের শিকার-করা জন্তুর মাংস খেত। রুটি বা ভাতের মতো কোনও খাবার জিনিস তাদের ছিল না কারণ তারা জমিতে কিছুই উৎপন্ন করতে পারত না। তারা রান্না করতে জানত না, কেবল আগুনে মাংস ঝলসে নিত। রান্নার জন্যে কোনও বাসনপত্র, ঘটি বাটি এবং চাটু ছিল না।

একটি ব্যাপার খুব আশ্চর্যের, এই বর্বর মানুষেরা কী করে ছবি আঁকতে হয় তা জানত। অবশ্য তাদের কাগজ কলম পেনসিল বা তুলি কিছুই ছিল না। ছিল শুধু পাথরের ছুঁচ এবং ছুঁচলো যন্ত্রপাতি। এইসব দিয়ে তারা গুহার দেয়ালে নক্‌শা কাটত কিংবা জন্তুজানোয়ারের ছবি আঁকত। কতকগুলি ছবি খুবই ভাল কিন্তু প্রায় সবগুলি হল পার্শ্ব রেখাচিত্র। তুমি জানো, পার্শ্বচিত্র আঁকা অপেক্ষাকৃত সহজ এবং ছোট ছেলেমেয়েরা সাধারণত এইভাবেই ছবি আঁকে। গুহার ভেতরটা ছিল অন্ধকার, তারা সম্ভবত কোনও একধরনের আলো

ব্যবহার করত।

যে সব মানুষের কথা এতক্ষণ বললাম তাদের বলা হয় প্যালিওলিথিক (Palaeolithic) বা পুরাতন প্রস্তরযুগের মানুষ। এ যুগে মানুষ পাথর দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করত বলে এই যুগকে বলা হয় প্রস্তর যুগ। তারা ধাতুর ব্যবহার জানত না। এখন তোমার নিজের ব্যবহারের বেশির ভাগ জিনিসই ধাতু, বিশেষ করে লোহা দিয়ে তৈরি। তখন লোহা বা ব্রোঞ্জের কথা মানুষ জানত না। তারা ব্যবহার করত কেবল পাথর। কিন্তু পাথর দিয়ে কাজ করতে খুব অসুবিধে হত।

গুহাচিত্র

AMARBOI.COM

প্রস্তর যুগ শেষ হওয়ার আগে পৃথিবীর জলবায়ু ভীষণভাবে বদলে যায়। আবহাওয়া আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। হিমবাহ সরতে সরতে উত্তর মহাসাগরের দিকে চলে যায় এবং মধ্য এশিয়া এবং ইউরোপে বড় বড় জঙ্গল দেখা দেয়। এইসব জঙ্গলে একধরনের নতুন মানুষকে আমরা বসবাস করতে দেখি। এতক্ষণ যে পুরাতন প্রস্তরযুগের মানুষের কথা বললাম তাদের চেয়ে এই নতুন মানুষেরা ছিল আরও বুদ্ধিমান। কিন্তু তখনও পর্যন্ত তারা পাথর দিয়েই অস্ত্রশস্ত্র যন্ত্রপাতি তৈরি করত। সুতরাং এইসব মানুষকেও পুরাতন প্রস্তরযুগের মানুষ বলা হত, আসলে এই সময়টা ছিল ওই যুগের শেষ পর্ব। এই যুগের মানুষকে নিওলিথিক (Neolithic) বা নব্যপ্রস্তর যুগের মানুষ বলা হয়।

নব্যপ্রস্তর যুগের মানুষের কথা বিচার করলে দেখা যায় যে এরা জীবনে দারুণ উন্নতি করেছিল। বুদ্ধির জোরে মানুষ অন্য প্রাণীদের তুলনায় আরও দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে চলে। নব্যপ্রস্তর যুগের মানুষ কৃষিকাজের মতো একটি বিরাট জিনিস আবিষ্কার করে। তারা জমি চাষ করে খাদ্য উৎপাদন করতে শুরু করে। মানুষের জীবনে এ একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। সারাদিন পশু শিকার করে খাদ্য জোগাড় করার চেয়ে এখন তারা অনেক সহজে নিজেদের খাদ্য পেতে থাকে। ফলে তাদের অনেক বেশি অবসর মেলে। আরও বিশ্রাম নেবার এবং চিন্তা-ভাবনা করার সময় তারা পায়। যতই তারা অবসর পেতে থাকে ততই তারা নানা নতুন নতুন জিনিস ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করে জীবনে ক্রমশ উন্নতি ঘটাতে থাকে। তারা মাটির পাত্র তৈরি

করতে শুরু করে এবং এইসব পাত্রে নিজেদের খাবার রান্না করতে থাকে। পাথরের হাতিয়ারকে আরও উন্নত এবং সুন্দরভাবে পালিশ করা হল। তারা গোরু, কুকুর, ভেড়া ও ছাগলকে পোষ মানাতে শিখল। কেমন করে কাপড় বুনতে হয় তাও তারা শিখল।

তখন মানুষ বড়ঘরে বা কুঁড়েঘরে বাস করত। এই কুঁড়েঘরগুলি তারা প্রায়ই কোনও হ্রদের মাঝখানে তৈরি করত, যাতে কোনও বন্য জন্তু বা অপর কোনও মানুষ তাদের সহজে আক্রমণ করতে না পারে। এজন্যে এইসব মানুষকে বলা হত হ্রদবাসী মানুষ (lake-dwellers)।

তুমি হয়তো অবাক হয়ে ভাবছ এ যুগের মানুষের সম্বন্ধে এত কথা আমরা কীভাবে জানতে পেরেছি।

তারা নিজেরা তো কোনও বই লিখে রেখে যায়নি। কিন্তু তোমাকে আগেই বলেছি, যে বই থেকে এই মানুষদের কথা আমরা জানতে পেরেছি তা হল প্রকৃতির নিজের লেখা বই—প্রকৃতির রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা নানান জিনিস হল এই বইয়ের এক-একটি পৃষ্ঠা। এর ভাষা বুঝতে পারা খুব সহজ নয়। অসীম ধৈর্য ধরে তা পড়তে হয়। অনেক মানুষ সারা জীবন ধরে এই বই পড়তে চেষ্টা করেছেন। তাঁরা অনেক ফসিল এবং পুরনো দিনের নানা জিনিসের অবশিষ্ট অংশ সংগ্রহ করেছেন। এইসব ফসিল সংগ্রহ করে বড় বড় মিউজিয়ামে রাখা আছে। নব্যপ্রস্তর যুগের মানুষের তৈরি চমৎকার পালিশ করা কুঠার, পাত্র, পাথরের তীর ও ছুঁচ, এবং আরও নানা জিনিস আমরা মিউজিয়ামে দেখতে পাই। তুমি নিজেও এরকম অনেক জিনিস দেখেছ, এবং হয়তো তা ভুলে গেছ। এখন যদি আবার তুমি সেগুলি দেখ তাহলে আরও ভালভাবে তাদের তাৎপর্য বুঝতে পারবে।

আমার মনে পড়ছে জেনিভার মিউজিয়ামে হ্রদবাসী মানুষের তৈরি ঘরের একটি সুন্দর মডেল আছে। হ্রদের মধ্যে অনেকগুলি কাঠের খুঁটি পোঁতা হত, এবং খুঁটির ওপরে পাতা হত একটি কাঠের পাটাতন। এই পাটাতনের ওপর তৈরি করা হত কাঠের কুঁড়েঘর। ডাঙার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্যে ছিল একটি ছোট সেতু।

নব্যপ্রস্তর যুগের মানুষ পশুর চামড়া বা সময় সময় শণের তৈরি মোটা কাপড় দিয়ে নিজেদের দেহ ঢেকে রাখত। শণ একরকমের গাছ, যার আঁশ থেকে কাপড় তৈরি হয়। শণ থেকে এখন একধরনের মিহি কাপড় তৈরি হয়। সে যুগে শণের কাপড় ছিল খুব মোটা।

এযুগের মানুষ ক্রমেই নানা উন্নতি করতে থাকে। তারা তামা ও ব্রোঞ্জ দিয়ে যন্ত্রপাতি তৈরি করতে শুরু করল। তুমি জানো তামা আর টিন মিশিয়ে ব্রোঞ্জ তৈরি হয় এবং ওই দুটি ধাতুর চেয়ে ব্রোঞ্জ বেশি শক্ত। তারা সোনা ব্যবহার করতেও শিখল এবং সোনার গয়না তৈরি করার জন্যে কত-না ব্যর্থ চেষ্টা তারা করেছিল।

সম্ভবত দশ হাজার বছর আগে এইসব মানুষ পৃথিবীতে বাস করত। অবশ্য সঠিক তারিখ বা সময় স্থির করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বেশিরভাগই আমাদের অনুমান করে নিতে হয়েছে। তুমি কি লক্ষ্য করেছ এ পর্যন্ত আমরা লক্ষ লক্ষ বছর আগেকার কথা আলোচনা করেছি। আস্তে আস্তে আমরা বর্তমান কালের কাছাকাছি চলে আসছি। নব্যপ্রস্তর যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত মানুষের অগ্রগতির ধারা ব্যাহত হয়নি কিংবা হঠাৎ কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। কিন্তু তবুও আমরা নবপ্রস্তর যুগের মানুষের চেয়ে অনেক আলাদা ধরনের। মানুষের জীবনে পরিবর্তন এসেছে ধীরে ধীরে, যেমন প্রাকৃতিক নিয়মে ঘটে থাকে। নানান জাতের মানুষ যে যার বৈশিষ্ট্য অনুসারে উন্নতি করতে থাকে, যে যার নিজের মতো বসবাস করতে থাকে। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন ধরনের জলবায়ু থাকায় মানুষকে তার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে হয়েছিল এবং এইভাবে তার জীবনে বিরাট পরিবর্তন ঘটেছিল। পরে আমি সে কথা বলব।

আর একটি কথা আজ তোমাকে বলব। নব্যপ্রস্তর যুগ যখন শেষ হয়ে আসছে সে সময় মানুষের জীবনে এক ভয়ঙ্কর বিপর্যয় ঘটে। আগেই বলেছি সে সময় ভূমধ্যসাগরের কোনও অস্তিত্ব ছিল না। সে জায়গায় ছিল কয়েকটি হ্রদ এবং সেইসব হ্রদে অনেক মানুষ বাস করত। হঠাৎ একদিন ইউরোপ ও আফ্রিকার মাঝে জিব্রালটারের কাছাকাছি ভূখণ্ড জলপ্লাবনে ভেসে গেল এবং আটলান্টিক মহাসাগরের জল ভূমধ্যঅঞ্চলের নিচু উপত্যকায় ঢুকতে থাকে। জল বাড়তে থাকে এবং ক্রমে সারা উপত্যকাটি জলে ভর্তি হয়ে যায়। হ্রদের কাছে বা হ্রদের মধ্যে যে অসংখ্য মানুষ বাস করত তারা জলে ডুবে গেল। তাদের কোথাও পালিয়ে যাওয়ার উপায় ছিল না। শত শত মাইল জুড়ে উপত্যকায় শুধু জল আর জল। আটলান্টিক মহাসাগরের জল ওই জায়গায় আসতেই থাকে, অবশেষে উপত্যকাটি একেবারে জলে ভর্তি হয়ে গিয়ে ভূমধ্যসাগরের সৃষ্টি হল।

AMARBOI.COM

এই মহাপ্লাবনের কথা তুমি শুনেছ এবং হয়তো বা পড়েও থাকবে। বাইবেলে এর কথা আছে এবং আমাদের কোনও কোনও সংস্কৃত বইয়ে এর উল্লেখ আছে। এই মহাপ্লাবনেই হয়তো ভূমধ্যঅঞ্চলটি জলে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। এ এক ভয়ঙ্কর বিপর্যয়। সামান্য যে ক'জন মানুষ নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে পেরেছিল তারা তাদের সন্তানদের কাছে এই বিপর্যয়ের কাহিনী বলেছিল। সেই সন্তানেরা আবার তাদের বংশধরদের এই কাহিনী শুনিয়েছিল। এইভাবে বংশপরম্পরায় জলপ্লাবনের কাহিনীটি চলে আসছে।

বিভিন্ন জাতির উৎপত্তি

AMARBOI.COM

আগের চিঠিতে নব্যপ্রস্তর যুগের মানুষের কথা আলোচনা করেছি। এরা প্রধানত হ্রদের মধ্যে বাড়ি তৈরি করে বসবাস করত। তারা নানা ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি করেছিল। তারা কৃষিকাজ উদ্ভাবন করেছিল। কীভাবে রান্না করতে হয় এবং জীবজন্তুকে পোষ মানিয়ে কাজে লাগানো যায় তা তারা জানত। এইসব ঘটেছিল হাজার হাজার বছর আগে এবং তাদের সম্বন্ধে বেশি কিছু আমরা জানি না। এখনকার পৃথিবীতে আমরা যে সব বিভিন্ন জাতির মানুষ দেখতে পাই সম্ভবত তাদের অধিকাংশই হল এই নব্যপ্রস্তর যুগের মানুষের বংশধর। তুমি জানো আমরা এখন সাদা, হলদে, তামাটে এবং কালো রঙের মানুষ দেখতে পাই। কিন্তু পৃথিবীর মানুষকে এই চারভাগে ভাগ করা সহজ নয়। বিভিন্ন জাতির মধ্যে মিশ্রণ ঘটেছে। মানুষের মধ্যে কে কোন জাতির তা বলা কঠিন। বিজ্ঞানীরা মানুষের মাথার পরিমাপ করে থাকেন এবং এই পরিমাপ থেকে তাঁরা কখনও কখনও তাদের জাতি নির্ণয় করে থাকেন। জাতি নির্ণয় করবার আরও উপায় আছে।

কীভাবে এইসব বিভিন্ন জাতির উদ্ভব হয়েছিল? যদি তারা সবাই একটি মাত্র জাতি থেকেই উদ্ভূত হয়ে থাকে তাহলে তাদের পরস্পরের মধ্যে এত পার্থক্য কেন? তুমি জানো, একজন জার্মান একজন নিগ্রোর চেয়ে একেবারে ভিন্ন ধরনের। একজনের রং ফরসা, অন্যজনের কালো। জার্মানদের চুল হালকা রঙের এবং লম্বা। নিগ্রোদের চুল কালো রঙের, ছোট ছোট এবং কোঁকড়ানো। এ দুজনের চেয়ে আবার একজন চিনার চেহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। কীভাবে এরকম সব পার্থক্য ঘটেছিল তা বলা কঠিন, কিন্তু এরকম পার্থক্যের কয়েকটি কারণ আমরা জানি। তোমাকে আগেই বলেছি কীভাবে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার ফলে প্রাণীর জীবনে ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটেছিল। এমন হতে পারে যে জার্মান এবং নিগ্রো বিভিন্ন মনুষ্য জাতি থেকে এসেছে কিন্তু কোনও-না-কোনও সময়ে তাদের পূর্বপুরুষ ছিল একই জাতির মানুষ। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেবার চেষ্টার ফলেই অবশ্য জাতিতে জাতিতে এমন পার্থক্য

দেখা দিয়েছিল। কিংবা কিছু জীবজন্তুর মতো কিছু মানুষ অন্যদের তুলনায় নিজেদের পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে আরও সহজে মানিয়ে নিতে পেরেছিল বলেই এমন পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছিল।

সুদূর উত্তর অঞ্চলে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ও বরফের দেশে যে সব মানুষ বাস করে তাদের ঠাণ্ডা সহ্য করার শক্তি অর্জন করতে হবে। আজও এস্কিমোরা উত্তরমেরুর বরফের দেশে বাস করে। এবং তারা প্রচণ্ড ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারে। তুমি যদি তাদের আমাদের মতো গরম দেশে নিয়ে আসো তারা হয়তো মরে যাবে। পৃথিবীর অন্যান্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায় তাদের অনেক কষ্ট করে জীবন যাপন করতে হয়। অন্যান্য দেশের মানুষ যেমন অনেক কিছু শিখেছে, এস্কিমোরা তেমন শিখতে পারেনি। আফ্রিকা কিংবা বিষুবরেখার কাছাকাছি অঞ্চলের অধিবাসীরা, স্থানীয় আবহাওয়া উত্তপ্ত হওয়ার জন্যে গরমে বসবাস করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। সূর্যের প্রচণ্ড তাপে তাদের গায়ের রং কালো হয়ে যায়। সমুদ্রের ধারে বা অন্য কোথাও বেশিক্ষণ রোদে বসে থাকলে তুমি দেখবে তোমার রং তামাটে হয়ে গেছে। এখন তোমার যা গায়ের রং তার চেয়ে কিছুটা কালো হয়ে যাবে। কয়েক সপ্তাহ বেশিক্ষণ রোদে থাকলে যদি তোমার রং কালো হয়ে যায় তাহলে যে সব মানুষ সব সময় প্রচণ্ড রোদের মধ্যে বসবাস করে তাদের রং কত বেশি কালো হয়ে যাবে? শত শত বছর ধরে প্রচণ্ড রোদের মধ্যে বাস করতে থাকলে মানুষের গায়ের রং পুরুষানুক্রমে কালো হতে হতে শেষে একদিন ঘোর কালো হয়ে দাঁড়াবে। তুমি দেখেছ আমাদের দেশের চাষীরা দুপুরের রোদে ক্ষেতে কাজ করছে। পরনে নামমাত্র কাপড়, বেশি কাপড়-জামা কেনার ক্ষমতা তাদের নেই। তার সারা গা রোদে পুড়ে যাচ্ছে, এভাবেই তার জীবন কেটে যায়। তার গায়ের রং তো কালো হবেই।

কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, মানুষের গায়ের রং মূলত নির্ভর করে যে আবহাওয়ায় সে বসবাস করে তার ওপর। এর সঙ্গে মানুষের যোগ্যতা, গুণ বা সৌন্দর্যের কোনও সম্পর্ক নেই। একজন শ্বেতকায় মানুষ যদি দীর্ঘদিন কোনও গরম দেশে বাস করে আর যদি সে রোদ এবং তাপ থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্যে ঘরের মধ্যে পাখার নীচে বসে না থাকে তবে তার গায়ের রং একদিন কালো হয়ে যাবে। তুমি জানো আমরা কাশ্মীরের লোক, দুশো বছরেরও আগে আমাদের পূর্বপুরুষ কাশ্মীরে বাস করত। কাশ্মীরে তুমি দেখবে সকলের, এমনকী চাষী ও শ্রমিকদেরও গায়ের রং খুব ফরসা। এর কারণ কাশ্মীর হল শীতপ্রধান দেশ। কাশ্মীরের এই মানুষেরাই আবার যখন নীচে নেমে এসে ভারতের অন্যান্য জায়গায়, যেখানকার আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত গরম, বাস করতে থাকে, কয়েক পুরুষ পরে তাদের গায়ের রং কালো হয়ে যায়। আমার অনেক কাশ্মীরি বন্ধুর গায়ের রং খুব ফরসা, আবার অনেকে আছেন যাদের রং বেশ কালো। ভারতের ওইসব জায়গায় যত বেশি দিন কাশ্মীরি পরিবার বসবাস করবে তাদের গায়ের রং ততই কালো হবে।

মানুষের গায়ের রং আসলে নির্ভর করে দেশের জলবায়ুর ওপরেই। অবশ্য এমন হতে পারে গরম দেশে বাস করলেও কিছু লোককে ঘরের বাইরে খোলা জায়গায় কাজ করতে হয় না, বড় বড় বাড়িতে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকার মতো টাকা তাদের আছে এবং নিজেদের গায়ের রং যাতে ময়লা না হয় সেজন্যে তারা যত্ন নিয়ে থাকে। বংশানুক্রমে একটি ধনী পরিবার এভাবে বসবাস করতে পারে এবং এজন্যে জলবায়ু তাদের গায়ের রঙের বিশেষ বদল ঘটাতে পারে না। কিন্তু নিজে কোনও কাজ না করে অন্যের পরিশ্রমের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকা কোনও গর্বের ব্যাপার নয়।

তুমি লক্ষ্য করে দেখবে ভারতের উত্তর অঞ্চলে কাশ্মীর ও পঞ্জাবের অধিবাসীদের গায়ের রং সাধারণত ফরসা। যতই দক্ষিণ দিকে যাবে দেখবে মানুষের রং কালো। মাদ্রাজ ও সিংহলে [বর্তমানের শ্রীলঙ্কায়] তুমি তো দেখেছ মানুষের রং ঘোর কালো। অবশ্য তুমি বলবে এর কারণ সেখানকার জলবায়ু। কারণ দক্ষিণ দিকে যাওয়ার ফলে তুমি বিষুবরেখার অনেক কাছে চলে এসেছ এবং সেজন্যে সেখানকার আবহাওয়া গরম হয়ে উঠেছে। এটা খুবই সত্যি এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের গায়ের রঙের তারতম্যের প্রধান

AMARBOI.COM

কারণ হল জলহাওয়া। পরে আমরা দেখব গায়ের রঙের এই তারতম্যের জন্যে অংশত দায়ী বাইরে থেকে যে সব বিভিন্ন জাতির মানুষ ভারতে এসেছিল তাদের নিজেদের মধ্যে যে পার্থক্য ছিল সেই পার্থক্য। প্রাচীন কালে বহু জাতির মানুষ ভারতে এসেছে। দীর্ঘকাল তারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বাঁচিয়ে রাখলেও, এক সময় বাধ্য হয়েই তাদের পরস্পর মিলেমিশে থাকতে হয়। কোনও একজন ভারতীয় মূল কোন্ জাতির মানুষ, একথা আজ বলা খুবই কঠিন।

AMARBOI.COM

বিভিন্ন জাতি ও ভাষা

পৃথিবীর কোন অংশে মানুষ প্রথমে জন্ম নিয়েছিল বা কোন অঞ্চলে তারা প্রথমে বসতি করেছিল তা আমরা সঠিকভাবে বলতে পারি না। পৃথিবীর কয়েকটি জায়গায় হয়তো প্রায় একই সময়ে মানুষের জন্ম হয়েছিল। সম্ভবত তুষার যুগের হিমবাহ যখন গলে গিয়ে উত্তর দিকে সরে যেতে থাকে মানুষ তখন অপেক্ষাকৃত উষ্ণ অঞ্চলে বসবাস করতে থাকে। বরফ সরে যাওয়ায় সেখানে দেখা দিল ঘাসে-ঢাকা শুকনো বিশাল প্রান্তর। সাইবেরিয়ায় তুন্দ্রা অঞ্চলে এখন যেমন দেখা যায়। এইসব জায়গা নিশ্চয়ই তৃণভূমিতে পরিণত হয়েছিল। মানুষ সেখানে চারদিকে ঘুরে বেড়িয়ে তাদের পোষা গোরু ছাগলের জন্যে ঘাস সংগ্রহ করত। এইসব মানুষ কোনও একটা নির্দিষ্ট জায়গায় বাস করত না, তারা সবসময়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াত। এজন্যে তাদের বলা হত যাযাবর। এখনও পৃথিবীর বহু দেশে, এমনকী ভারতেও, বেদেদের মতো যাযাবর দেখা যায়।

মানুষ প্রথম দিকে নিশ্চয়ই বড় বড় নদীর ধারে বসতি করেছিল, কারণ এইসব জায়গার জমি ছিল খুব উর্বর এবং চাষবাসের উপযোগী। এখানে প্রচুর জল পাওয়া যেত এবং সহজেই জমিতে খাদ্য উৎপাদন করা যেত। সেজন্যে আমাদের মনে হয় মানুষ ভারতে সিন্ধু ও গঙ্গা, মেসোপটেমিয়ায় টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস এবং মিশরে নীল ইত্যাদি বড় বড় নদ-নদীর ধারে বসতি করেছিল। চিন দেশে এভাবে বসতি গড়ে উঠেছিল।

ভারতে সবচেয়ে প্রাচীন যে জাতির কথা আমরা জানি তারা হল দ্রাবিড় জাতি। পরে দেখব, ভারতে এসেছিল আর্য এবং পূর্ব এশিয়ার মঙ্গোল জাতির লোক। বর্তমানে দক্ষিণ ভারতে যে সব লোক বাস করে তাদের বেশিরভাগই দ্রাবিড় জাতির বংশধর। অপেক্ষাকৃত বেশি দিন ভারতে বসবাস করার ফলে দ্রাবিড়দের গায়ের রং উত্তর ভারতের অধিবাসীদের তুলনায় বেশ কালো। দ্রাবিড়রা ছিল খুব উন্নত, সভ্য জাতি। তাদের নিজস্ব ভাষা ছিল। অন্যান্য জাতির সঙ্গে তারা ভালভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। কিন্তু আমরা বোধ হয় একটু তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাচ্ছি।

সেই প্রথম যুগে মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ায় এবং পূর্ব ইউরোপে একটি নতুন জাতির উদয় হচ্ছিল। এদের বলা হয় আর্য জাতি। সংস্কৃত ভাষায় এই 'আর্য' নামে একটি শব্দ আছে, যার অর্থ হল ভদ্র মানুষ বা উঁচু-বংশের মানুষ। আর্যদের অন্যতম ভাষা ছিল সংস্কৃত । এর অর্থ তারা নিজেদের খুব ভদ্র এবং উঁচু-বংশের মানুষ মনে করত। নিজেদের সম্পর্কে তাদের মনে বেশ অহঙ্কার ছিল, এখনও যেমন অনেকের মধ্যে দেখা যায়। তুমি জানো, একজন ইংরেজ নিজেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে মনে করে। একজন ফরাসিরও ধারণা তারাই হল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। জার্মান, আমেরিকান এবং অন্যান্য লোকেরা নিজেদের এই রকমই ভাবে।

এই আর্যরা উত্তর এশিয়া এবং ইউরোপের বিস্তীর্ণ তৃণভূমি অঞ্চলে ঘুরে বেড়াত। কিন্তু যতই তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং আবহাওয়া ক্রমেই শুষ্ক ও ভূমি তৃণহীন হতে থাকে, সকলের দরকারমতো খাদ্য মেলা কঠিন হয়ে পড়ে। খাদ্যের সন্ধানে বাধ্য হয়ে তারা পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় চলে যেতে থাকে। এইভাবে তারা ইউরোপের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল এবং ভারতবর্ষ, পারস্য এবং মেসোপটেমিয়ায়

এসেছিল। এজন্যে বলতে পারি, এখন পরস্পরের মধ্যে যতই পার্থক্য থাকুক, ইউরোপ, উত্তর ভারত, পারস্য এবং মেসোপটেমিয়ার প্রায় সমস্ত মানুষের পূর্বপুরুষ ছিল একই জাতি—আর্য। অবশ্য এসবই বহু বহুকাল আগের ঘটনা। তারপর মানুষের জীবনে অনেক কিছু ঘটেছে, জাতিতে জাতিতে ব্যাপক মিশ্রণ ঘটেছে। সুতরাং আর্যরা হল পৃথিবীর বর্তমান মনুষ্য জাতির এক মহান পূর্বপুরুষ।

আর একটি প্রধান জাতি হল মঙ্গোল। এরা পূর্ব-এশিয়ার সব জায়গায়—চিন, জাপান, তিব্বত, শ্যামদেশ ও ব্রহ্মদেশে—-ছড়িয়ে পড়েছিল। কখনও কখনও এদের পীতজাতি বলা হয়। সাধারণত এদের চোয়ালের হাড় উঁচু, চোখ ছোট ছোট।

আফ্রিকা এবং আরও কয়েকটি জায়গার অধিবাসীদের বলা হয় নিগ্রো। এরা আর্যও নয়, মঙ্গোলও নয়। এদের গায়ের রং ঘোর কালো।

আরব ও প্যালেস্টাইনের অধিবাসীদের বলা হয় আরব ও হিব্রু। এরা ভিন্ন এক জাতির মানুষ।

হাজার হাজার বছরের মধ্যে এইসব জাতি ভাগ হয়ে ছোট ছোট নানান জাতিতে পরিণত হয় এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে কিছুটা মিশ্রণ ঘটে। অবশ্য এ নিয়ে আমাদের এখন ভাবার দরকার নেই। বিভিন্ন জাতির মধ্যে তফাত করার একটি প্রধান এবং চমৎকার উপায় হল সেইসব জাতির ভাষা বিচার করা। প্রথম

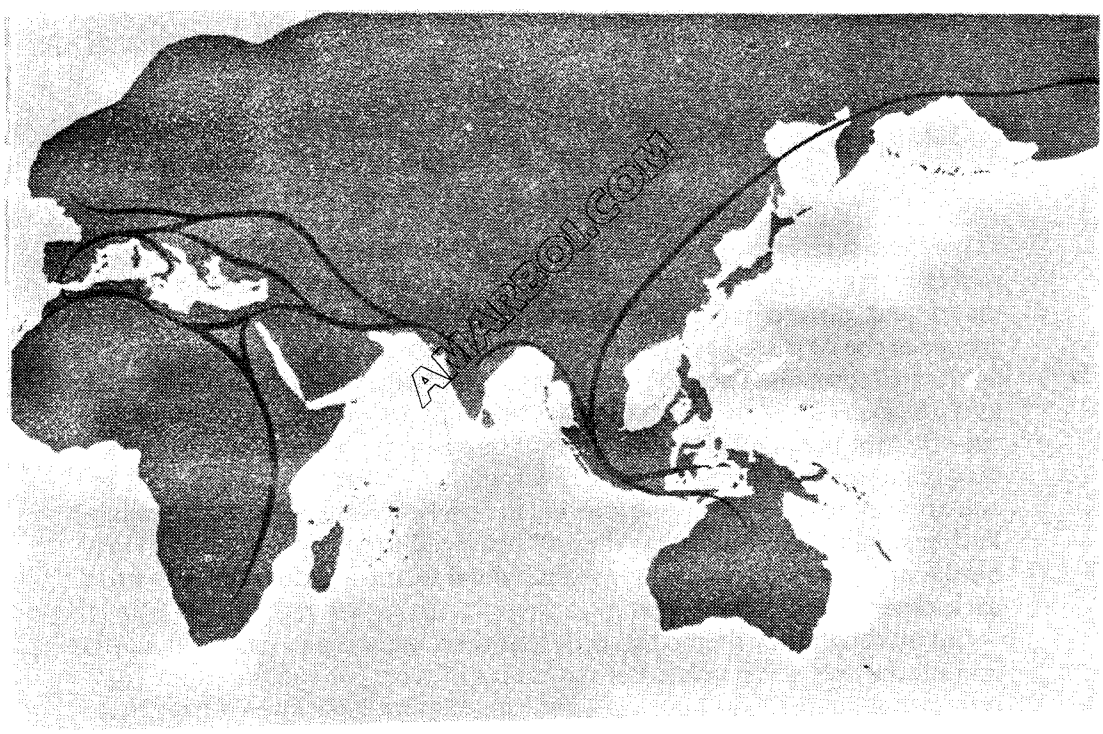
AMARBOI.COM

প্রথম যুগের মানুষের দেশান্তরে যাওয়ার গমনপথ

দিকে প্রত্যেক জাতির নিজস্ব একটি ভাষা ছিল। কালক্রমে সেই একটি ভাষা থেকে আরও নানান ভাষার সৃষ্টি হয়। এই সমস্ত ভাষা ছিল একটি মূল ভাষার সন্তানের মতো এবং তারা ছিল একই ভাষাগোষ্ঠীর। বিভিন্ন ভাষার মধ্যে এমন কিছু শব্দ আমরা পাই যেগুলি সব ভাষাতেই আছে (Common words) এবং তা থেকে বিভিন্ন ভাষার মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

আর্যরা যখন এশিয়া এবং ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ল তখন তারা আর নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখতে পারেনি। সে সময় কোনও রেলগাড়ি, টেলিগ্রাফ বা চিঠিপত্র পাঠাবার ব্যবস্থা ছিল না, এমনকী কোনও লেখা বইও ছিল না। সেজন্যে আর্যদের প্রতিটি দল নিজেদের সুবিধামতো একটি ভাষায় কথা বলতে শুরু করে এবং কিছুকাল পরে এই ভাষা তার মূল ভাষা থেকে অথবা অন্য আর্য অঞ্চলের ভাষা থেকে একেবারে পৃথক হয়ে দাঁড়ায়। একারণে এখন পৃথিবীতে আমরা এতগুলি ভাষা দেখতে পাই।

এইসব ভাষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে আমরা দেখতে পাব উপ-ভাষার সংখ্যা অনেক হলেও মূল ভাষার সংখ্যা মাত্র কয়েকটি। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, আর্যরা যে সব জায়গায় গিয়েছিল সেখানে আর্যগোষ্ঠীর ভাষা চালু হয়েছিল। সংস্কৃত, ল্যাটিন, গ্রিক, ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, ইতালিয় এবং আরও কিছু ভাষা হল যেন সহোদর এবং এ ভাষাগুলি এসেছে আর্যগোষ্ঠীর ভাষা থেকে। হিন্দি, উর্দু, বাংলা, মরাঠি, গুজরাটি প্রভৃতি ভারতীয় ভাষার উদ্ভব হয়েছে সংস্কৃত ভাষা থেকে এবং এই ভাষাগুলিও আর্যগোষ্ঠীর ভাষা।

আর একটি প্রধান ভাষোগোষ্ঠী হল চিনা ভাষা। এই গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে চিনা, বর্মী, তিব্বতি ও শ্যামদেশের ভাষা।

তৃতীয় ভাষাগোষ্ঠী হল সেমীয় ভাষা (Semitic)। এর মধ্যে রয়েছে আরবী ও হিব্রু ভাষা।

তুর্কি ও জাপানি ভাষার মতো কয়েকটি ভাষা প্রধান এই তিনটি বিভাগের কোনওটির মধ্যেই পড়ে না। তামিল, তেলুগু, মলয়ালাম এবং কন্নড় প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি ভাষাও এরকম কোনও ভাগের মধ্যে পড়ে না। এই চারটি ভাষা হল দ্রাবিড়গোষ্ঠীর ভাষা এবং এগুলি খুব প্রাচীন।

AMARBOI.COM

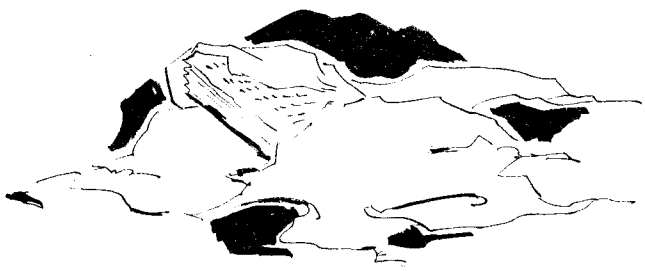

বিভিন্ন ভাষার মধ্যে সম্পর্ক

আমরা দেখেছি কীভাবে আর্যরা নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং যেখানেই তারা গিয়েছিল সেখানে তারা নিজেদের ভাষায়, তা যেমনই হোক না কেন, কথা বলত। কিন্তু বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন আবহাওয়া ও বিভিন্ন পরিবেশ আর্যদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর জীবনে নানারকম পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। প্রতিটি গোষ্ঠী নতুন নতুন অভ্যাস এবং রীতি অনুসরণ করে যে যার বৈশিষ্ট্যমতো নিজেদের জীবনে নানা রকম পরিবর্তন আনতে থাকে। সে সময় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া ছিল খুব কষ্টকর। সেজন্যে একটি গোষ্ঠী অন্য দেশের অপর গোষ্ঠীর সঙ্গে মেলামেশা করতে পারত না। প্রতিটি গোষ্ঠী ছিল অন্য গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন। একটি দেশের মানুষ নতুন কিছু শিখলে তা তারা অন্য অঞ্চলের কোনও গোষ্ঠীকে জানাতে পারত না। এইভাবে পরিবর্তন ঘটতে থাকে এবং কয়েক পুরুষ পরে আদি আর্য পরিবার অনেকগুলি পরিবারে ভাগ হয়ে যায়। তারা হয়তো ভুলেই গিয়েছিল যে তারা সবাই অবশ্য একই বড় পরিবারের লোক। তাদের একটি ভাষা থেকে অনেকগুলি ভাষা সৃষ্টি হয় এবং দেখা গেল একটি ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার বিরাট পার্থক্য রয়েছে।

ভাষাগুলি ভিন্ন ধরনের মনে হলেও এমন অনেক শব্দ আছে যেগুলি সব ভাষাতেই দেখা যায়। এ ছাড়া আরও অনেক মিল চোখে পড়ে। হাজার হাজার বছর কেটে যাবার পর, এমনকী আজও বিভিন্ন ভাষায় এধরনের শব্দগুলি চোখে পড়ে। এ থেকে বুঝতে পারা যায় একসময় এইসব ভাষা ছিল মূলত এক। তুমি জানো, ফরাসি এবং ইংরেজি ভাষায় এধরনের অনেক শব্দ আছে। 'বাবা' ও 'মা'—এ দুটি ঘরোয়া এবং সাধারণ শব্দ বিচার করে দেখা যাক। হিন্দি এবং সংস্কৃতে এই দুটি শব্দকে 'পিতা' ও 'মাতা', ল্যাটিনে 'পেট্যার' এবং 'মেট্যার' ('pater' and 'mater') গ্রিকে 'পেট্যার' ও 'মেটার' ('pater', 'meter'), জার্মানিতে 'ফাতর' ও 'মুতর' ('vater', 'mutter'), ফরাসিতে 'পিয়ের' ও 'মিয়ের' ('pere', 'mere') এবং এভাবে অন্য অনেক ভাষায় বলা হয়। এই শব্দগুলি শুনলে কী এগুলিকে একই ধরনের বলে মনে হয় না? জ্ঞাতি ভাই-বোনের মতো এই শব্দগুলির মধ্যে যেন একটা সাদৃশ্য আছে। এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনেক শব্দ অবশ্য নেওয়া হয়েছে। ইংরেজি ভাষা থেকে অনেক শব্দ হিন্দিতে নেওয়া হয়েছে। আবার হিন্দি থেকে কিছু শব্দ ইংরেজিতে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু 'বাবা' ও 'মা'—এই দুটি শব্দ কোনও গৃহীত শব্দ নয়। এ দুটি কোনও নতুন শব্দ নয়। একেবারে প্রথমে মানুষ যখন একে অন্যের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে তখন তো তাদের বাবা ও মা ছিল এবং বাবা ও মা বোঝাতে মানুষ এই দুটি শব্দ অবশ্যই ব্যবহার করত। সেজন্যে বলতে পারি এই দুটি শব্দ কোনও ধার করা শব্দ নয়। একই পূর্বপুরুষ বা একই পরিবার থেকে এই দুটি শব্দের ব্যবহার মুখে মুখে চলে এসেছে। এ থেকে আমরা জানতে পারি যে এখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে একে অন্যের থেকে অনেক দূরে বসবাস করে নিজেরা বিভিন্ন ভাষায় কথা বললেও এক সময় সমস্ত মানুষ এক বৃহৎ পরিবারেরই অংশ ছিল।

দেখবে, ভাষা নিয়ে আলোচনা আমাদের কেমন কৌতূহল জাগায় এবং কত-কী শেখায়। তিন-চারটি ভাষা জানা থাকলে আরও কয়েকটি ভাষা শেখা তেমন কঠিন ব্যাপার নয়।

AMARBOI.COM

HAWAIIAN

No ka mea, ua al[illegible] ua i ko ke ao [illegible] hiwa-
[illegible] ua hana [illegible] hiwa, i ole e make i [illegible]
ia, ia ke ola mau ia

HEBREW

[illegible]

CHEROKEE

[illegible]

CHINESE

必得永生。的不至滅們叫凡亡。生子信賜給他人甚至將獨愛世

MANCHU

[illegible]

ICELANDIC

Því að svo elskaði Guð heiminn, að hann gaf son sinn eingetinn, til þess að hver sem á hann trúir, glatist ekki, heldur [illegible]

ESKIMO

[illegible]

AMHARIC (Abyssinia)

[illegible]

PASHTO, or AFGHANI

[illegible]

QUECHUA

Imaraykuu Diosqa chay jinatapunin kaypachata munakuyqan, nispan Churinta qorqan, tukuy jaqay paypi jiqnin, ama wañunanpaq, yallinraq wiñay kawsayniyoq kanampaq.

BALINESE

[illegible]

JAPANESE

神はそのひとり子を賜わったほどに、この世を愛されたので、永遠のいのちを得るためにと、御子を信じる者は、だれでも、[illegible]

TIBETAN

[illegible]

BURMESE

[illegible]

ARABIC

لأنَّ هكذا أحبَّ اللهُ العالَمَ حتّى بذلَ ابنَهُ الوحيدَ لكي لا يَهلِكَ كلُّ مَن يؤمِنُ بِهِ بل تكونُ لهُ الحياةُ الأبديّةُ.

GREEK (ancient)

Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλ' ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον

BATTA, or BATAK (Central Sumatra)

[illegible]

IRISH

Óir ir mar ro do ṡraoḋaiġ Dia an domhan, gur ṫug sé a aon-ṡeanmac uathu, ionas nach ḃfuil aon ann, naċ ḟaġaḋ sé beaṫa maireaċtaċ aige.

Sic nũ dũs dilexit mũdũ ut filiũ suũ unigenitũ darẽt: ut omnis qui credit in eũ non pereat: sed habeat vitam eternã.

AMARBOI.COM

আরও দেখবে, বেশির ভাগ মানুষ এখন একে অন্যের থেকে অনেক দূরে বিভিন্ন দেশে বাস করলেও বহু পূর্বে আমরা একই জাতির মানুষ ছিলাম। এর পর থেকে আমাদের জীবনে বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে এবং আমাদের মধ্যে পুরনো সম্পর্কের কথা অনেকেই ভুলে গেছে। প্রত্যেক দেশের মানুষ মনে করে যে তারাই শ্রেষ্ঠ ও বুদ্ধিমান এবং অন্যেরা আদৌ তাদের মতো নয়। ইংরেজরা মনে করে তারা এবং তাদের দেশ সবার চেয়ে ভাল। ফরাসিরা নিজেদের দেশ ও দেশের সব কিছুর জন্যে খুব গর্ব বোধ করে। জার্মান এবং ইতালিয়রা মনে করে তাদের গৌরবের আর শেষ নেই। অনেক ভারতীয়র ধারণা ভারত নানা দিক থেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশ। এসবই হল নিজেদের সম্বন্ধে বড় বেশি অহঙ্কার। প্রত্যেকেই নিজেকে এবং নিজের দেশকে বড় মনে করে। কিন্তু আসলে প্রত্যেক মানুষ হল ভালয়-মন্দয় মিশিয়ে। একইভাবে এমন কোনও দেশ নেই যা নিছক ভাল বা নিছক মন্দ। যেখানে যা কিছু ভাল চোখে পড়বে তা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে এবং মন্দ যা কিছু, তা যেখানেই থাক না কেন, বর্জন করতে হবে। আমরা অবশ্য নিজের দেশ ভারতের ভাল-মন্দের কথাই আগে ভাবব। দুঃখের বিষয় এখন ভারতের অবস্থা বড় খারাপ। বেশির ভাগ লোক খুব গরিব, বড় কষ্টে তাদের জীবন কাটে। তাদের জীবনে আনন্দ নেই। কীভাবে তাদের সুখী করা যায় তার উপায় আমাদের খুঁজে বার করতে হবে। নিজেদের আচার-ব্যবহার এবং রীতি-নীতির মধ্যে যেগুলি ভাল তা বাঁচিয়ে রাখায় চেষ্টা করতে হবে, আর যা মন্দ তা বর্জন করতে হবে। অন্য দেশের ভাল কিছু চোখে পড়লে অবশ্যই তা গ্রহণ করতে হবে।

ভারতীয় হিসেবে আমাদের ভারতেই থাকতে হবে এবং এ দেশের জন্যে কাজ করতে হবে। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে আমরা পৃথিবীর বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর একটি অংশ এবং অন্য দেশে যে সব মানুষ বাস করে তারাও আমাদের আত্মীয়ের মতো। পৃথিবীর সব মানুষ যদি সুখী এবং তৃপ্ত হয় তাহলে কী আনন্দের ব্যাপারই না হয়। সেজন্যে আমাদের চেষ্টা করা দরকার এই পৃথিবীকে আরও সুন্দর বাসযোগ্য করে তোলা।

AMARBOI.COM

সভ্যতা কাকে বলে?

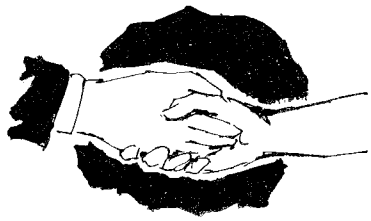

এবার প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলব। কিন্তু তার আগে সভ্যতা কাকে বলে সে বিষয়ে একটা ধারণা করে নেওয়া দরকার। অভিধানে তুমি দেখবে সভ্যতার অর্থ হল মানুষের জীবন ও রুচিকে আরও উন্নত ও মার্জিত করা, আদিম বর্বর জীবনের আচার-আচরণের বদলে আরও উন্নত আচার-আচরণ পালন করা। সভ্যতা বলতে বিশেষভাবে সমাজ বা কোনও একটি মানবগোষ্ঠীর জীবনে এমন রূপান্তর বোঝায়। আদিম অবস্থায় মানুষ যখন পশুর চেয়ে সামান্য উন্নত ছিল তখনকার জীবনকে বলা হয় বর্বর জীবন। সভ্যতা হল ঠিক তার বিপরীত। বর্বর যুগের আচার-ব্যবহার থেকে যতই আমরা দূরে সরে আসব ততই আমরা সভ্য হয়ে উঠব।

একজন মানুষ কিংবা কোনও একটি সমাজ বর্বর, না সভ্য—তা আমরা বুঝব কেমন করে? ইউরোপের অনেক মানুষ ভাবে তারা খুব সভ্য আর এশিয়ার লোকেরা একেবারে বর্বর। এশিয়া ও আফ্রিকার মানুষের তুলনায় তারা বেশি জামা-কাপড় পরে বলেই কি তাদের এরকম ধারণা হয়েছে? কিন্তু জামা-কাপড় পরা তো নির্ভর করে জলবায়ুর ওপর। গরম দেশের মানুষের তুলনায় ঠাণ্ডা দেশের লোক বেশি জামা-কাপড় পরে থাকে। কিংবা নিরস্ত্র একজন মানুষের চেয়ে একজন বন্দুকধারী বেশি শক্তিশালী বলেই কি সে অন্যের চেয়ে বেশি সভ্য? বন্দুকধারীকে অসভ্য বলতে দুর্বল মানুষের সাহস হবে না। এ কথা বললে তাকেই তাক করে গুলি ছোঁড়া হবে।

তুমি জানো, মাত্র কয়েক বছর আগে একটি মহাযুদ্ধ [প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, ১৯১৪-১৮] হয়ে গেছে। পৃথিবীর প্রায় সব দেশ এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। প্রত্যেকটি দেশ যতদূর পারা যায় বিপক্ষের লোককে হত্যা করতে চেষ্টা করেছে। ইংরেজরা প্রাণপণ চেষ্টা করেছে জার্মানদের হত্যা করতে। জার্মানরাও হত্যা করেছে ইংরেজদের। এই যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিহত হয়েছে এবং হাজার হাজার মানুষ সারা জীবনের মতো বিকলাঙ্গ হয়েছে। কত লোক চোখ নষ্ট হয়ে অন্ধ হয়ে যায়, কত লোক হাত বা পা হারায়। যুদ্ধে বিকলাঙ্গ এরকম অনেক মানুষ তুমি ফ্রান্স এবং অন্য জায়গায় দেখেছ। প্যারিসের পাতাল রেল মেট্রোতে এইসব বিকলাঙ্গদের জন্যে পৃথক বসার জায়গা আছে। তুমি কি মনে করো এভাবে পরস্পরকে হত্যা করা খুব ভাল বা বুদ্ধিমানের কাজ? রাস্তায় দু জন লোক মারামারি করলে পুলিশ এসে তাদের ছাড়িয়ে দেয়; পথচারীরা ভাবে লোক দুটি কী বোকা। বড় বড় দেশগুলির পক্ষে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করা এবং হাজার হাজার লোককে হত্যা করা তাহলে কত বোকামির কাজ। এ যেন জঙ্গলের মধ্যে দুটি বন্য লোক মরণপণ লড়াই করছে। আদিম বন্য মানুষকে যদি বর্বর বলা হয় তাহলে যে সব দেশ নিজেরা আজ এরকম আচরণ করছে তারা আরও কত বেশি বর্বর?

সভ্যতার প্রশ্নটি যদি তুমি এভাবে বিচার করো তাহলে তুমি বলবে ইংল্যান্ড, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি এবং আরও অনেক দেশ যারা এই মহাযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল এবং যারা অন্য দেশের লোককে হত্যা করেছিল তারা কোনওমতেই সভ্য দেশ নয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও তুমি জানো এসব দেশে অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস আছে

AMARBOI.COM

এবং সেখানেও অনেক ভাল লোক বাস করে।

তুমি হয়তো বলবে সভ্যতা বলতে কী বোঝায়, তা জানা সহজ নয়। তোমার কথাই ঠিক। প্রশ্নটি খুব কঠিন। সুন্দর সুন্দর বাড়িঘর, ছবি, বই এবং সুন্দর আর যা-কিছু আছে সবই নিশ্চয় সভ্যতার লক্ষণ। কিন্তু আরও ভাল লক্ষণ হল এমন একজন ভদ্র মানুষ যিনি নিজের স্বার্থের কথা না ভেবে অন্যদের সঙ্গে মিলে সবার যাতে ভাল হয় সেইরকম কাজ করে থাকেন। একা একা কাজ করার চেয়ে অন্যদের সঙ্গে মিলে কাজ করা অনেক ভাল এবং সকলের মঙ্গলের জন্যে কাজ করা হল সবচেয়ে ভাল কাজ।

গোষ্ঠীর জন্ম

AMARBOI.COM

আগের কয়েকটি চিঠিতে তোমাকে বলেছি মানুষ যখন পৃথিবীতে প্রথম আসে তার অবস্থা ছিল অন্য প্রাণীদের মতোই। হাজার হাজার বছর ধরে ধীরে ধীরে নিজের বিকাশ ঘটিয়ে সে কিছুটা উন্নত হল। প্রথম দিকে সে একা একা শিকার করত, এখনকার অনেক বন্য জন্তু যেমন করে থাকে। তারপর সে দেখল অন্যের সঙ্গে দল বেঁধে শিকার করা আরও বুদ্ধিমানের কাজ এবং নিরাপদ। দলবদ্ধ হয়ে থাকলে তাদের শক্তি বাড়বে, তারা বন্যপ্রাণী এবং এমনকী অন্য দলের মানুষের আক্রমণ থেকে নিজেদের আরও ভালভাবে রক্ষা করতে পারবে। পশুরাও তো নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। ভেড়া, ছাগল, হরিণ, এমনকী হাতিও দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। দলটি যখন ঘুমিয়ে থাকে, দলের কয়েকটি প্রাণী জেগে থেকে পাহারা দেয়। নেকড়ে বাঘের অনেক গল্প তুমি পড়ে থাকবে। রাশিয়ায় শীতকালে নেকড়ে বাঘ দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। খিদে পেলে, শীতকালে খিদেটা আবার বাড়ে, এরা মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। একটি নেকড়ে একা কোনও মানুষকে বড় একটা আক্রমণ করে না। কিন্তু দল বেঁধে থাকলে নেকড়েদের শক্তি বাড়ে। এরা মানুষের দলকে অনায়াসে আক্রমণ করে। প্রাণ বাঁচাতে মানুষ ছুটতে থাকে এবং প্রায়ই বরফের ওপর স্লেজগাড়িতে বসে-থাকা মানুষের সঙ্গে নেকড়ের দৌড় শুরু হয়ে যায়।

প্রথম যুগে সভ্যতার পথে মানুষের এগিয়ে চলার প্রথম ধাপ হল দলবদ্ধ হওয়া। এভাবে মানুষের এক একটি দলকে বলা হয় গোষ্ঠী। গোষ্ঠীর লোকেরা সবাই একসঙ্গে মিলে কাজ করতে থাকে। তাদের মধ্যে একটা সহযোগিতার ভাব দেখা দেয়। প্রত্যেক লোক আগে গোষ্ঠীর কথা, তারপর নিজের কথা ভাবত। গোষ্ঠীর কোনও বিপদ দেখা দিলে প্রতিটি লোক লড়াই করে গোষ্ঠীকে বাঁচাত। কোনও লোক গোষ্ঠীর জন্যে কাজ না করলে তাকে দল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হত।

সকলকে একসঙ্গে কাজ করতে হলে মানুষকে একটা নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়। প্রত্যেকে যদি যে

যার খুশিমতো কাজ করে তাহলে গোষ্ঠী টিকে থাকতে পারে না। কাজেই একজনকে গোষ্ঠীর নেতা হতে হয়। পশুদেরও একজন দলপতি থাকে। নিজেদের মধ্যে যে সবচেয়ে বলবান তাকেই গোষ্ঠীর লোকেরা নেতা হিসাবে বেছে নিল। তখন বেঁচে থাকার জন্যে মানুষকে প্রায়ই লড়াই করতে হত। সেজন্যে সবচেয়ে বলবান ব্যক্তিকে বেছে নেওয়া হয়েছিল।

গোষ্ঠীর লোকেরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করলে গোষ্ঠী ভেঙে যাবে। কাজেই গোষ্ঠীনেতার কাজ হল দলের মধ্যে যাতে কোনরকম মারামারি না হয় সেদিকে নজর রাখা। অবশ্য এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর লড়াই হতে পারে এবং তা হয়েও থাকত। নিজের স্বার্থসিদ্ধি করতে হলে একজনকে অপরের সঙ্গে মারামারি করতে হবে—এরকম পুরনো প্রথা রদ করে মানুষ উন্নতির পথে এগিয়ে চলে।

প্রথম দিকে গোষ্ঠীগুলি আসলে বড় বড় পরিবার নিয়ে গড়ে উঠেছিল। গোষ্ঠীর লোকেদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। কিন্তু পরিবারের লোকসংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে এবং গোষ্ঠী আকারে খুব বড় হয়ে দাঁড়ায়।

প্রাচীন কালে, বিশেষ করে গোষ্ঠী গড়ে ওঠার আগে, মানুষকে খুব কষ্ট করে বাঁচতে হত। তার কোনও ঘরবাড়ি ছিল না, কাপড় বলতে ছিল পশুর চামড়া আর তাকে সবসময় অন্যের সঙ্গে লড়াই করতে হত। নিজের রোজকার খাদ্য জোগাড় করতে তাকে পশু শিকার বা বাদাম ও ফল সংগ্রহ করতে হত। সে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিল যে তার চারদিকেই রয়েছে শত্রু। এমনকী প্রকৃতিও ছিল তার শত্রু কারণ সে ভাবত শিলাবৃষ্টি, তুষারপাত এবং ভূমিকম্পের জন্যে প্রকৃতি দায়ী। বেচারী মানুষ তখন সব কিছুর দাস, একা একা চুপিসাড়ে পৃথিবীর বুকে ঘুরে বেড়ায়, সব কিছুকে সে ভয় পায় কারণ কোনও কিছুই সে ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারে না। শিলাবৃষ্টি হলে ভাবত মেঘের ভেতর থেকে কোনও দেবতা তাকে আঘাত করতে চেষ্টা করছে। ভীষণ ভয় পেয়ে সে মেঘের ভেতর থেকে যে এরকম বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি বা তুষার পাঠাচ্ছে তাকে খুশি করতে চাইল। কিন্তু কীভাবে তাকে খুশি করা যায়? এ বিষয়ে তার কোনও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। ব্যাপারটি বুঝতে পারার মতো বুদ্ধি তার ছিল না। সে ভাবল আকাশের দেবতা বুঝি তারই মতো এবং তিনি খেতে ভালবাসেন। সেজন্যে সে কিছু মাংস নিয়ে কিংবা কোনও পশু হত্যা করে তা কোনও একটি জায়গায় রেখে আসত যাতে দেবতা তা গ্রহণ করতে পারেন। এভাবে পশুহত্যাকে বলা হত বলি দেওয়া। মানুষ ভাবত এভাবে সে বৃষ্টি বা শিলাবৃষ্টি বন্ধ করতে পারবে।

এইসব কাজ আমাদের এখন খুব ছেলেমানুষি মনে হতে পারে, কারণ আমরা জানি কেন বৃষ্টি বা শিলাবৃষ্টি হয়, কেন তুষার পড়ে। এর সঙ্গে পশুহত্যার কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু এরকম বোকামির কাজ এখনও আমাদের মধ্যে অনেকে মূর্খের মতো করে থাকে।

AMARBOI.COM

ধর্মের উদ্ভব এবং শ্রমবিভাগ

আগের চিঠিতে তোমায় বলেছি প্রাচীন যুগে মানুষ কীভাবে সবকিছুতে ভয় পেত এবং কল্পনা করত যা কিছু বিপদ-আপদ ঘটছে তার জন্যে দায়ী রাগী ও হিংসুটে দেবতারা। জঙ্গল, পাহাড়, নদী, আকাশ—সব জায়গাতে তারা এই কল্পিত দেবতাদের দেখতে পেত। ভগবান বলতে তারা দয়ালু এবং সজ্জন এমন মানুষ হিসেবে কাউকে ভাবত না, তাদের কাছে তিনি ছিলেন খুব বদমেজাজী মানুষ, যিনি সবসময়ই রাগ করে আছেন। ভগবানের রাগকে তারা ভয় করতে বলে, মানুষ সব সময় তাঁর উদ্দেশে কিছু-না-কিছু, বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্য, নিবেদন করে ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে চাইত। কখনও কখনও ভূমিকম্প, বন্যা বা মহামারীর মতো বিপর্যয়ে বহু লোক মারা গেলে তারা ভীষণ ভয় পেয়ে ভাবত দেবতারা খুব রাগ করেছেন। দেবতাদের সন্তুষ্ট করতে তারা নরবলি দিত। এমনকী নিজের সন্তানকেও হত্যা করে দেবতাদের উদ্দেশে নিবেদন করত। এমন কাজ নৃশংস বলে মনে হয় ঠিকই, কিন্তু প্রাণের ভয়ে মানুষ সব কিছু করতে পারে।

এই ভাবেই ধর্মের উদ্ভব হয়েছিল। ভয় পাওয়া থেকে মানুষের মনে ধর্মবোধ প্রথম দেখা দিয়েছিল এবং ভয় পেয়ে যে কাজ করা হয় তা মন্দ। তুমি তো জানো ধর্ম আমাদের অনেক ভাল, সুন্দর জিনিস শিখিয়েছে। বড় হয়ে তুমি পৃথিবীর সব দেশের ধর্ম এবং ধর্মের নামে যে সব ভাল ও মন্দ কাজ করা হয়েছে সে বিষয়ে পড়াশোনা করবে। মানুষের মনে কীভাবে ধর্মবোধ দেখা দিল সেই কৌতূহলকর ব্যাপারটি এবার বলব। পরে দেখব কীভাবে এই বোধ বেড়েছিল। কিন্তু ধর্মবোধ যতই বাড়ুক না কেন, আজও আমরা দেখতে পাই ধর্মের নামে মানুষ একে অন্যের সঙ্গে মারামারি করছে এবং একজন আরেকজনের মাথা ফাটাচ্ছে। আমাদের অনেকের কাছে ধর্ম আজও ভয়ের ব্যাপার। মন্দিরে মন্দিরে পুজো এবং উপচার পাঠিয়ে এবং এমনকী পশুবলি দিয়ে মানুষ কিছু কল্পিত দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করে।

প্রাচীন কালে মানুষ খুব কষ্টের মধ্যে দিন কাটাত। তাকে রোজ নিজের খাবার জোগাড় করতে হত, না করলে উপোস করে থাকতে হত। সে যুগে কোনও কুঁড়ে লোকের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল না। কারুর পক্ষে একদিন বেশি পরিমাণে খাবার জোগাড় করে রেখে দিয়ে অনেক দিন কোনও কাজ না করে থাকাও সম্ভব ছিল না।

গোষ্ঠী গড়ে উঠলে মানুষের জীবন কিছুটা সহজ হল। একজন লোক একা চেষ্টা করে যে পরিমাণ খাবার জোগাড় করবে, গোষ্ঠীর লোকেরা একসঙ্গে কাজ করলে তার চেয়ে অনেক বেশি জোগাড় করবে। তুমি জানো, সবাই মিলে বা অন্যের সহযোগিতায় আমরা অনেক কাজ করতে পারি, যা একা করা যায় না। একজন বা দুজন লোক হয়তো কোনও ভারী বোঝা বইতে পারবে না, কিন্তু কয়েকজনে মিলে চেষ্টা করলে তা সহজেই পারবে। সে যুগে মানুষের জীবনে আর একটি বড় রকমের উন্নতি ঘটেছিল, যার কথা আগেই বলেছি। তা হল কৃষিকাজ। শুনলে আশ্চর্য হবে কিছু কিছু পিঁপড়ের মধ্যে কৃষিকাজের সূচনা দেখা দিয়েছিল। অবশ্য একথা বলছি না যে পিঁপড়েরা জমিতে বীজ বুনত, লাঙল দিত এবং পরে ফসল তুলত। কিন্তু পিঁপড়েরা এই ধরনেরই কাজ করে। যে সব গুল্মের বীজ তারা খায়, সে রকম গুল্ম দেখতে পেলে

তারা ওই গুল্মের চারপাশের ঘাস যত্ন করে তুলে ফেলে দেয়। ফলে এইসব গুল্ম সহজে বেঁচে থাকতে পারে।

পিঁপড়েরা যা করে থাকে, হয়তো মানুষ এক সময় সে রকম কাজই করেছিল। কৃষিকাজ কাকে বলে তা তারা তখন জানত না। কৃষিকাজ ব্যাপারটা বুঝতে এবং জমিতে বীজ বোনা শুরু করতে মানুষের অনেক সময় লেগেছিল।

চাষবাস শুরু হওয়ার পর মানুষের পক্ষে খাবার জোগাড় করা অনেক সহজ হল। তাকে আর সারাদিন শিকারের জন্যে ঘুরে বেড়াতে হত না। এতদিন যেভাবে কষ্টের মধ্যে তাকে দিন কাটাতে হত, সে কষ্ট অনেকটা কমল। আর একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এল মানুষের জীবনে। কৃষিব্যবস্থার আগে প্রতিটি মানুষ ছিল শিকারি। মানুষকে তখন ওই একটি কাজই করতে হত। মেয়েরা সম্ভবত শিশুদের দেখাশোনা করত এবং ফলমূল জোগাড় করত। কৃষিকাজ শুরু হওয়ার ফলে আরও নানা ধরনের কাজ করা দরকার হয়ে পড়ল। যেমন, ক্ষেতের কাজ, শিকার করা, গোরু ছাগল ইত্যাদি দেখাশোনা করা। মেয়েরা সাধারণত গবাদি পশুর দেখাশোনা করত এবং দুধ দুইত। পুরুষদের মধ্যে এক একজন এক-এক ধরনের কাজ করত ।

এখন তুমি দেখতে পাও প্রতিটি মানুষ বিশেষ একধরনের কাজ করে থাকে। কেউ ডাক্তার, কেউ বা ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বাড়িঘর, সেতু ও রাস্তা তৈরি করছে, কেউ কেউ বা ছুতোর, কামার, রাজমিস্ত্রি, মুচি, দরজি ইত্যাদি। প্রত্যেকেই নিজের নিজের কাজে বিশেষ দক্ষ, অপরের কাজের বিষয়ে তেমন কিছু বা একেবারেই কিছু জানে না। একেই বলা হয় কাজের বা শ্রমের বিভাগ। একসঙ্গে অনেক কাজ করলে কোনওটাই ভালভাবে করতে পারা যায় না। তার চেয়ে কোনও লোক যদি কেবল একটি কাজ করতে চেষ্টা করে তাহলে সে ওই কাজ অনেক ভালভাবে করতে পারে। এখন পৃথিবীতে বহু ক্ষেত্রে শ্রমবিভাগ দেখা যায়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, কৃষিকাজ শুরু হবার পর থেকে প্রাচীন গোষ্ঠীদের মধ্যে ধীরে ধীরে শ্রমবিভাগ দেখা দিয়েছিল।

কৃষিকাজের ফলে যে সব পরিবর্তন আসে

আগের চিঠিতে আমি শ্রমবিভাগের বিষয়ে কিছু বলেছি। একেবারে প্রথম দিকে মানুষ যখন কেবল শিকার করে অতি কষ্টে দিন কাটাত, সে সময় কাজের কোনও রকম ভাগাভাগি ছিল না বললেই হয়। প্রত্যেককেই শিকার করে অতি কষ্টে নিজের খাদ্য জোগাড় করতে হত। অবশ্য স্ত্রী ও পুরুষের কাজের মধ্যে এক ধরনের ভাগ প্রথমে দেখা দিয়েছিল—পুরুষেরা শিকার করত আর মেয়েরা বাড়িতে থেকে সন্তান পালন এবং গৃহপালিত পশুর দেখাশোনা করত।

কৃষিকাজ শেখার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনে নানারকম পরিবর্তন দেখা দিল। প্রথমেই কাজের শ্রেণীবিভাগ। কেউ শিকার করত, কেউ জমিতে লাঙল দিত এবং ক্ষেতের কাজ দেখাশোনা করত। তারপর যতই দিন যেতে লাগল মানুষ অনেক নতুন নতুন কাজ শিখল এবং সেই সব কাজে সে বিশেষ দক্ষ হয়ে উঠল।

কৃষিকাজের আর একটি উল্লেখযোগ্য ফল—মানুষ গ্রামে শহরে বসবাস করতে শুরু করল। কৃষিকাজ জানার আগে সে ঘুরে বেড়াত আর শিকার করত। কোনও একটি নির্দিষ্ট জায়গায় তার বাস করার দরকার ছিল না। যেখানেই যেত সেখানেই সে কিছু-না-কিছু শিকার করতে পারত। নিজেদের পোষা গোরু ভেড়া এবং অন্যান্য প্রাণীদের জন্যে তাকে প্রায়ই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যেতে হত। এইসব প্রাণীদের জন্যে দরকার হত চারণভূমি, যেখানে তারা চরে ঘাস খেতে পারে। এক জায়গায় চরে খাওয়ার ফলে সেখানকার ঘাস ফুরিয়ে যেত। ঘাস গজাতে সময় লাগে। কাজেই গোষ্ঠীকে বাধ্য হয়ে অন্য এক জায়গায় চলে যেতে হত।

কৃষিকাজ শুরু করার পরে মানুষকে জমির কাছাকাছি থাকতে হত। যে জমি তারা লাঙল দিয়ে চষে

বীজ বুনেছে তা ছেড়ে তারা চলে যেতে পারে না। সেজন্যে বীজ বোনা থেকে শুরু করে ফসল তোলা পর্যন্ত তারা এক জায়গায় থেকে কাজ করত। এভাবে গ্রাম ও শহর গড়ে উঠল।

কৃষিকাজ আর একটি বড় পরিবর্তন এনেছিল, এর ফলে মানুষের জীবনযাত্রা আরও সহজ হল। সারাদিন শিকার করে খাদ্য জোগাড় করার চেয়ে জমি চাষ করে খাদ্যশস্য উৎপন্ন করা ছিল অনেক সহজ। এ ছাড়া জমি থেকে এত বেশি পরিমাণে খাদ্য পাওয়া যেতে লাগল যে সেগুলি খেয়েও ফুরিয়ে যেত না। এই বাড়তি খাদ্য মানুষ যত্ন করে জমিয়ে রাখত।

আর একটি কৌতূহলকর অগ্রগতির কথা এবার আলোচনা করা যাক। যখন মানুষ ছিল নিছক শিকারি তখন সে কোনও কিছু জমিয়ে রাখতে পারত না, পারলেও অতি অল্পই। সে কোনওরকমে খাদ্য জোগাড় করে প্রাণধারণ করত। তখন কোনও ব্যাঙ্ক ছিল না যেখানে সে টাকা বা অন্য জিনিস গচ্ছিত রাখতে পারে। প্রতিদিন শিকার করে তাকে নিজের খাবার জোগাড় করতে হত। কৃষিকাজ আয়ত্ত করার পর একবার চাষ করে সে যা খাদ্যশস্য পেত তার সবটা দরকার হত না। এই বাড়তি বা উদ্বৃত্ত খাদ্য সে সঞ্চয় করে রাখত। এই প্রথম আমরা উদ্বৃত্ত খাদ্য দেখতে পেলাম। নিজের দরকারমতো খাদ্য পেতে হলে যে পরিশ্রম করতে হত তার চেয়েও আরও বেশি পরিশ্রম করার ফলে মানুষ এই উদ্বৃত্ত খাদ্য পেয়েছিল।

তুমি জানো, আমাদের দেশে এখন অনেক ব্যাঙ্ক আছে। লোকে সেখানে টাকা জমা রাখে এবং চেক লিখে ওই টাকা তোলে। এই টাকা আসে কোথা থেকে? তুমি যদি এ নিয়ে ভাবো, দেখবে ওই টাকা সবই হল উদ্বৃত্ত টাকা। অর্থাৎ যে টাকা মানুষ একেবারে খরচ করতে চায় না বলেই ব্যাঙ্কে জমিয়ে রাখে। এখন যাদের হাতে প্রচুর টাকা আছে তারাই ধনী লোক, গরিবের হাতে কিছুই নেই। এই বাড়তি টাকা কীভাবে আসে তা পরে তুমি জানতে পারবে। অপরের চেয়ে কেউ বেশি পরিশ্রম করলে যে তার হাতে বাড়তি টাকা আসবে তা কিন্তু ঠিক নয়। বরং যে লোক আদৌ কোনও কাজ করে না তারই বাড়তি টাকা আছে; আর যে কঠোর পরিশ্রম করে বাড়তি কোনও টাকা তার থাকেই না। এটা খুবই অদ্ভুত ব্যাপার বলে মনে হবে। এ কারণেই অনেকে মনে করেন এ জাতীয় অদ্ভুত অবস্থার জন্যেই পৃথিবীতে এত গরিব লোক আছে। এ ব্যাপারটি মনে হয় তোমার পক্ষে এখন বুঝতে পারা বেশ কঠিন হবে। যদি তাই হয় তাহলে এ নিয়ে মাথা ঘামিও না। কিছুদিন পরে তুমি ব্যাপারটি বুঝতে পারবে।

এখন তোমাকে কেবল এই কথাটি মনে রাখতে বলব যে চাষবাসের ফলে মানুষের যা প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হল। এই বাড়তি খাদ্য মজুত রাখা হত। সে সময় কোনও ব্যাঙ্ক বা টাকাকড়ির ব্যাবহার ছিল না। যাদের অনেক গোরু ভেড়া বা উট থাকত অন্যেরা তাদের বলত বড়লোক।

গোষ্ঠীপতি: কীভাবে সে এল

মনে হচ্ছে আমার চিঠিগুলি কেমন যেন জটিল হয়ে পড়ছে। আমাদের চারপাশে যে জীবন আমরা দেখি তা কিন্তু আসলে খুব জটিল। প্রাচীন যুগে জীবন ছিল অনেক সহজ সরল। যে সময় থেকে মানুষের জীবনে জটিলতা দেখা যায় আমরা এখন সেই সময়ের কথা আলোচনা করব। আমরা যদি ধীরে ধীরে অনুসন্ধান করে মানুষের জীবনে ও সমাজে যে সব পরিবর্তন এসেছে তা বুঝবার চেষ্টা করি তাহলে বর্তমান কালের অনেক কিছু আমরা সহজে বুঝতে পারব। এরকম চেষ্টা না করলে আমাদের চারপাশে যা ঘটছে তার কিছুই বুঝতে পারব না। আমাদের অবস্থা হবে জঙ্গলের অন্ধকারে পথ-হারানো শিশুর মতো। সেজন্যে আমি তোমাকে একেবারে যেখান থেকে জঙ্গল শুরু হয়েছে সেই জায়গায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। এতে আমরা জঙ্গল পার হবার রাস্তাটি খুঁজে পাব।

তোমার মনে পড়বে, মুসৌরীতে তুমি আমাকে রাজাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলে—কাদের রাজা বলা হয়, কেনই বা তারা রাজা হয়েছিল। দূর অতীতে যখন রাজা প্রথম দেখা গিয়েছিল আমরা এবার সেই দিকে তাকিয়ে দেখব। প্রথম দিকে রাজা বলে কাউকে ডাকা হত না। কিন্তু তাদের সম্বন্ধে কোনওকিছু খোঁজার চেষ্টা করলে কীভাবে রাজার উদ্ভব হয়েছিল তা জানতে পারব।

কীভাবে গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল সে কথা তোমাকে আগে বলেছি। কৃষিকাজ শুরু হবার পর সমাজে কাজের একরকম শ্রেণীবিভাগ হয়েছিল। তখন এমন কিছু লোকের দরকার হল যারা গোষ্ঠীর কাজ ঠিকমতো করার ব্যবস্থা করতে পারে। এমনকী এরও আগে গোষ্ঠী এমন একজনকে খুঁজছিল যে অন্য গোষ্ঠীদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় তাদের চালনা করতে পারবে। সাধারণত গোষ্ঠীর সবচেয়ে প্রবীণ ব্যক্তি হত গোষ্ঠীর নেতা। তাকে বলা হত, বা এখন আমরা বরং বলে থাকি, গোষ্ঠীপতি। বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়ায় তাকে সবচেয়ে অভিজ্ঞ এবং জ্ঞানী মনে করা হত। গোষ্ঠীর অন্যান্যদের সঙ্গে গোষ্ঠীপতির বিশেষ তফাত ছিল না। সকলের সঙ্গে সে কাজ করত এবং খাদ্যশস্য যা জন্মাত তা সবাইকে ভাগ করে দেওয়া হত। তখন কিন্তু এখনকার মতো প্রত্যেকের আলাদা বাড়ি, টাকাকড়ি এবং আরও অনেক ধরনের জিনিস ছিল না। একজন যা কিছু উপার্জন করত তা ছিল গোষ্ঠীর সম্পত্তি এবং সেজন্যে অন্যদের তা ভাগ করে দেওয়া হত। ভাগ-বাঁটোয়ারা করত গোষ্ঠীপতি।

ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটতে থাকে। সমাজে নতুন নতুন কাজ দেখা দিল, বিশেষ করে কৃষিকাজ শুরু হওয়ার পরে। গোষ্ঠীপতির বেশির ভাগ সময় কেটে যেত এইসব কাজ যাতে ঠিকমতো করা হয় তার ব্যবস্থা করতে এবং সবাই ঠিকমতো কাজ করছে কিনা তা তদারক করতে। আস্তে আস্তে গোষ্ঠীপতিকে অন্যদের সঙ্গে মিলে সাধারণ কাজ করা ছেড়ে দিতে হল। ফলে গোষ্ঠীপতি অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এক ব্যক্তি হয়ে পড়ল। এখন আমরা আর একধরনের শ্রমের বা কাজের বিভাগ দেখতে পাই। গোষ্ঠীপতির দায়িত্ব হল সব কাজ ঠিকমতো করানোর ব্যবস্থা করা। সে অন্যদের হুকুম করে আর অন্যরা গোষ্ঠীপতির হুকুমমতো ক্ষেতে কাজ করে, শিকার করে কিংবা লড়াই করতে যায়। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে লড়াই বা সংঘর্ষ বাধলে

গোষ্ঠীপতির ক্ষমতা আরও বাড়ে, কারণ নেতা ছাড়া ভালভাবে লড়াই করা যায় না। এভাবে গোষ্ঠীপতি খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

কাজ ক্রমে বেড়ে যাওয়ায় গোষ্ঠীপতি একা সব কিছুর ব্যবস্থা বা দেখাশোনা করতে পারত না। নিজের কাজে সাহায্য করার জন্যে সে কয়েকজনকে বেছে নিল। এভাবে গোষ্ঠীতে অনেক সংগঠক দেখা দিল, অবশ্য গোষ্ঠীপতি ছিল এদের প্রধান। গোষ্ঠী তখন দু শ্রেণীতে ভাগ হয়ে গেল—সংগঠক ও শ্রমিক। গোষ্ঠীর সব মানুষ আর সমান রইল না। সংগঠকদের ক্ষমতা সাধারণ শ্রমিকদের চেয়ে অনেক বেশি হল।

পরের চিঠিতে বলব গোষ্ঠীপতিরা কীভাবে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠল।

গোষ্ঠীপতি: কীভাবে তাদের প্রাধান্য বাড়ল

প্রাচীন যুগের গোষ্ঠী এবং গোষ্ঠীপতিদের কথা শুনতে আশা করি তোমার খারাপ লাগছে না। আগের চিঠিতে তোমায় বলেছি সে যুগে সব সম্পত্তির মালিক ছিল গোষ্ঠী। গোষ্ঠীর কোনও লোকের পৃথকভাবে কিছু ছিল না। এমনকী গোষ্ঠীপতিরও নিজের বলে কোনও সম্পত্তি ছিল না। গোষ্ঠীর একজন মানুষ হিসাবে সে অন্যদের মতো নিজের অংশটি পেত। কিন্তু গোষ্ঠীর সব কিছুর ব্যবস্থা করার দায়িত্ব ছিল তার। তাকেই গোষ্ঠীর সম্পত্তি ও সব জিনিসপত্র দেখাশোনা করতে হত। কাজের দায়িত্ব যত বাড়তে থাকে, সে ভাবতে শুরু করল এইসব সম্পত্তি ও জিনিসপত্র আসলে তার নিজের, গোষ্ঠীর নয়। অথবা সে ভেবেছিল দলের নেতা হিসাবে সে-ই গোষ্ঠীর মালিক। কোনও জিনিস নিজে অধিকার করার চিন্তাটি এভাবে শুরু হয়। এখন আমরা সব সময় কোনও জিনিসকে 'আমার' বা 'তোমার' বলে ভাবি এবং মুখ ফুটে সে কথা বলি। কিন্তু তোমাকে আগেই বলেছি, প্রথম দিকে গোষ্ঠীর লোকেরা এভাবে চিন্তা করত না। তখন সবকিছু ছিল গোষ্ঠীর সম্পত্তি।

প্রবীণ গোষ্ঠীপতি নিজেকে গোষ্ঠী বলে ভাবতে শুরু করল এবং সেজন্যে গোষ্ঠীর বেশির ভাগ জিনিস তার নিজের বলে মনে করত।

গোষ্ঠীপতির মৃত্যু হলে গোষ্ঠীর লোকেরা সকলে এক জায়গায় বসে একজনকে তাদের নেতা বা গোষ্ঠীপতি হিসাবে নির্বাচন করত। সাধারণভাবে গোষ্ঠীপতির পরিবারের লোকেরা অন্যদের চেয়ে গোষ্ঠী পরিচালনার কাজ ভালভাবে জানত। তারা গোষ্ঠীপতির সঙ্গে সবসময় থাকত এবং তাকে কাজে সাহায্য করত। কাজেই তাদের পক্ষে গোষ্ঠীর কাজ জানা সম্ভব ছিল। এজন্যে দেখা যেত গোষ্ঠীপতির মৃত্যু হলে গোষ্ঠীর লোকেরা ওই পরিবার থেকেই কাউকে বেছে নিত। এভাবে গোষ্ঠীপতির পরিবার অন্য সব পরিবার থেকে পৃথক হয়ে দাঁড়ায় এবং গোষ্ঠীর লোকেরা সব সময় ওই পরিবার থেকে দলপতি মনোনয়ন করত। গোষ্ঠীপতির হাতে অনেক ক্ষমতা ছিল। স্বভাবতই সে চাইত তার নিজের ছেলে বা ভাই তার জায়গায় গোষ্ঠীপতি হয়ে বসুক। এরকম যাতে হয় সেজন্যে সে সাধ্যমত চেষ্টা করত। এই উদ্দেশ্যে সে নিজের ছেলে

বা ভাই বা কোনও নিকট আত্মীয়কে এমনভাবে কাজ শেখাত যাতে তাদের মধ্য থেকে কেউ তার জায়গায় বসতে পারে। এমনকী সে গোষ্ঠীর সবাইকে জানিয়েও রাখত যে, তার শূন্য পদে বসার জন্যে সে একজনকে বেছে নিয়ে সব কাজ শিখিয়েছে। মনে হয় প্রথম প্রথম গোষ্ঠীর লোকেরা তাদের কাছে এভাবে বলা পছন্দ করত না। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে এরকম কথা শুনতে তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং সবসময় গোষ্ঠীপতির মনোমতো কাজই তারা করতে থাকে। নতুন গোষ্ঠীপতি স্থির করার সময় আসলে কোনও নির্বাচন বা বাছাবাছি হত না। আগের গোষ্ঠীপতি ঠিক করে রাখত কে তার শূন্য পদে বসবে এবং সেই লোকটিই গোষ্ঠীপতি হত।

এইভাবে গোষ্ঠীপতির পদটি বংশানুক্রমিক হয়ে পড়ে। অর্থাৎ একই পরিবারের মধ্যে তা আবদ্ধ থাকে। পিতার পর পুত্র কিংবা তার অন্য কোনও আত্মীয়—এইভাবে পদটি পূরণ হতে থাকে। গোষ্ঠীপতি এবার নিশ্চিন্ত হল যে গোষ্ঠীর সব সম্পত্তির আসল মালিক সে নিজে। এমনকী তার মৃত্যুর পর সব কিছু রইল তার পরিবারের দখলে। কোনও জিনিস 'আমার' বা 'তোমার' এরকম ধারণা কীভাবে জন্ম নেয় তা আমরা দেখতে পেলাম। প্রথম দিকে সমাজে কারও মনে এ রকম কোনও ধারণা ছিল না। সবাই একসঙ্গে কাজ করত গোষ্ঠীর জন্যে, নিজের জন্যে নয়। খাদ্যশস্য বা অন্য জিনিস, বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হলে, সবাই নিজের নিজের ভাগ পেত। তখন গরিব বা বড়লোক বলে কেউ ছিল না। সকলেই ছিল গোষ্ঠীর সম্পত্তির অংশীদার।

কিন্তু যখন গোষ্ঠীপতি গোষ্ঠীর সম্পত্তি আত্মসাৎ করে নিজের বলে ঘোষণা করল তখন থেকে আমরা সমাজে দু শ্রেণীর লোক দেখতে পাই—কেউ গরিব, কেউ বড়লোক।

পরের চিঠিতে তোমাকে এ বিষয়ে আরও কিছু জানাব।

AMARBOI.COM

গোষ্ঠীপতি হল রাজা

অনেক দিন ধরে গোষ্ঠীপতিদের কথা বলছি। এবার তাদের সম্বন্ধে বলা শেষ করব। বরং বলা যায়, তাদের নাম বদল করা হবে। কীভাবে রাজা দেখা দিল এবং তারা কী রকম ছিল সে কথা তোমায় জানাব, এই বলে শুরু করেছিলাম। রাজাদের বিষয়টি বুঝতে হলে আমাদের একেবারে গোষ্ঠীপতিদের কথায় ফিরে যেতে হবে। তুমি নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ যে এই গোষ্ঠীপতিরা (ইংরেজিতে patriarch) পরে রাজা বা মহারাজা হল। পেট্রিআরক্ শব্দটি এসেছে ল্যাটিন `Pater' শব্দ থেকে, যার অর্থ হল পিতা। ওই ব্যক্তি ছিল কোনও গোষ্ঠী বা দলের নেতা বা পিতা। `Patria' শব্দটি, যার অর্থ হল পিতৃভূমি বা কারও স্বদেশ, ওই একই ল্যাটিন শব্দ থেকে এসেছে। ফরাসি ভাষায় একে বলে `Patrie'. সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষায় আমরা স্বদেশকে মা বা 'মাতৃভূমি' বলে ভাবি। কোনটি তোমার পছন্দ?

গোষ্ঠীপতির পদটি যখন বংশানুক্রমিক হয়ে দাঁড়াল, অর্থাৎ ছেলে বাবার পদে বসল, তখন গোষ্ঠীপতির সঙ্গে রাজার পার্থক্য বিশেষ ছিল না বললেই হয়। গোষ্ঠীপতি পরিণত হল রাজায়। রাজার মনে একটা অদ্ভুত ধারণা জন্মায় যে, সে দেশের সব কিছুর মালিক। দেশ বলতে সে নিজেকেই ভাবত। একজন বিখ্যাত ফরাসি রাজা বলেছিলেন—'রাষ্ট্র! সে তো আমিই' বা 'রাষ্ট্র মানেই তো আমি।' রাজারা ভুলে গিয়েছিল যে আসলে দেশের লোককে সংগঠিত করতে এবং খাদ্যশস্য ও অন্যান্য জিনিসপত্র সবার মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার জন্যে লোকে তাদের নির্বাচিত করেছিল। একথা তাদের মনে ছিল না যে, দল বা দেশের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ ভেবে লোকে তাদের রাজা হিসেবে বেছে নিয়েছিল। রাজারা মনে করেছিল যে তারা দেশের মালিক এবং বাকি সব লোক তাদের দাস। সত্যি বলতে কি, রাজারা ছিল দেশের লোকের সেবক।

পরে ইতিহাস পড়লে জানতে পারবে, রাজাদের অহঙ্কার এত বেড়েছিল যে তারা মনে করত তাদের রাজা হওয়ার ব্যাপারে সাধারণ লোকের কোনও হাত নেই। তারা বলল যে স্বয়ং ঈশ্বর তাদের রাজপদে বসিয়েছেন। রাজা হওয়ার ব্যাপারটাকে তারা 'রাজার স্বর্গীয় অধিকার' (divine right of king) বলে মনে করত। বহুকাল ধরে তারা দেশের লোকের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করত। দেশের লোকে যখন অনাহারে রয়েছে তারা তখন বিলাসে ও জাঁকজমকের মধ্যে জীবন কাটাত। সাধারণ মানুষ বেশি দিন এ অবস্থা সহ্য করতে পারল না। কোনও কোনও দেশের লোক তাদের রাজাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিল। পরে তুমি এ বিষয়ে সব কিছু বই পড়ে জানতে পারবে—কীভাবে ইংল্যান্ডের লোকে রাজা প্রথম চার্লসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাকে যুদ্ধে হারিয়েছিল এবং এমনকি তাকে হত্যাও করেছিল। ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটি মহাবিপ্লব ঘটেছিল। সেখানকার সাধারণ মানুষ রাজপদ উঠিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তোমার হয়তো মনে পড়বে প্যারিসে আমরা কনসিয়েরজেরি (Conciergerie) জেল দেখতে গিয়েছিলাম। তুমি কি তখন আমাদের সঙ্গে ছিলে? ওই জেলে ফ্রান্সের রাজার স্ত্রী মেরি আঁতোয়ানেৎ, রাজ পরিবারের লোক এবং আরও অনেককে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। রাশিয়ার মহান বিপ্লবের কথাও তুমি পড়বে। মাত্র কয়েক বছর

AMARBOI.COM

আগে রাশিয়ার জনসাধারণ তাদের রাজা জারকে বিতাড়িত করেছে।

রাজাদের যুগ শেষ হয়ে এল। পৃথিবীর বহু দেশে এখন রাজা নেই। ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়া, সুইজারল্যান্ড, আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্য, চিন এবং আরও নানা দেশে এখন আর রাজার অস্তিত্ব নেই। সে দেশগুলি হল প্রজাতন্ত্র, অর্থাৎ সে দেশের জনসাধারণ একটা সময় অন্তর অন্তর তাদের শাসক বা নেতাদের নির্বাচিত করে থাকে। এই শাসকদের পদটি উত্তরাধিকার সূত্রে পূরণ করা হয় না।

তুমি জানো, ইংল্যান্ডে এখনও একজন রাজা আছেন। কিন্তু আসলে তাঁর কোনও ক্ষমতা নেই। তিনি নিজে বিশেষ কিছু করতে পারেন না। সমস্ত ক্ষমতা পার্লামেন্টের। জনসাধারণের নির্বাচিত ব্যক্তিরা পার্লামেন্টের সদস্য। লন্ডনে পার্লামেন্ট দেখার কথা তোমার মনে পড়বে।

ভারতে এখনও অনেক রাজা, মহারাজা এবং নবাব আছেন। দেখবে, তাঁরা অত্যন্ত শৌখিন পোশাক পরে দামি মোটর গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এবং নিজেদের সুখ সুবিধা বিলাসের জন্য প্রচুর টাকাপয়সা খরচ করছেন। এত টাকা তাঁরা কোথা থেকে পান? প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায় করে তাঁরা এই টাকা পেয়ে থাকেন। সকলের মঙ্গল এবং উন্নতির কাজে খরচ করার জন্যে কর দেয়া হয়। যেমন, স্কুল হাসপাতাল মিউজিয়াম লাইব্রেরি, ভাল রাস্তা তৈরি করা কিংবা আরও নানা ভাল কাজ করা। আমাদের এইসব রাজা ও মহারাজারা এখনও এককালের সেই ফরাসি রাজার মতো ভাবেন—'রাষ্ট্র! সে তো আমিই।' জনসাধারণের টাকা তাঁরা নিজেদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য আরামের জন্যে খরচ করেন। নিজেরা বিলাসে ডুবে থাকেন, আর প্রজারা যারা কঠিন পরিশ্রম করে কর যোগাচ্ছে, তাদের অনাহারে দিন কাটে। তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর কোনও ব্যবস্থা নেই।

AMARBOI.COM

প্রাচীন যুগের সভ্যতা

গোষ্ঠীপতি এবং রাজাদের বিষয়ে অনেক কথা বলেছি। এবার আরও একটু পিছন ফিরে প্রাচীন সভ্যতা এবং প্রাচীন যুগের অধিবাসীদের কথা আলোচনা করব।

প্রাচীন যুগের মানুষ সম্পর্কে আমরা বেশি কিছু জানি না। তবে প্রস্তর যুগ কিংবা নব্যপ্রস্তর যুগের তুলনায় এই যুগের মানুষের বিষয়ে আমরা অনেক বেশি কথা জানতে পেরেছি। হাজার হাজার বছর আগে যে সব বড় বড় বাড়ি তৈরি হয়েছিল তার ধ্বংসাবশেষ এখন আমরা খুঁজে পাচ্ছি। এইসব বাড়ি, মন্দির আর প্রাসাদ দেখে সে যুগের মানুষ কীরকম ছিল এবং তারা কী করত সে সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করতে পারি। বিশেষ করে এইসব পুরনো বাড়ির ভাস্কর্য এবং খোদাই-করা শিল্পকাজ আমাদের খুব সাহায্য করে। এইসব ভাস্কর্য দেখে সে সময়ে মানুষ কী ধরনের পোশাক পরত এবং আরও অনেক বিষয়ের কথা আমরা জানতে পারি।

মানুষ কোথায় প্রথম বসতি স্থাপন করে সভ্যতা গড়ে তুলেছিল তা আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না। কেউ কেউ বলেন আটলান্টিক মহাসাগরে অ্যাটলান্টিস নামে একটি বিরাট দেশ ছিল। বলা হয়, এই দেশে অনেক লোক বাস করত এবং তারা খুব সভ্য ছিল। কোনও না কোনওভাবে একদিন আটলান্টিক মহাসাগর পুরো দেশটিকে গ্রাস করে এবং এ দেশের কোনও চিহ্নই আর রইল না। কতকগুলি গল্প ছাড়া এই ঘটনার কোনও প্রমাণ আমরা পাইনি। কাজেই এ নিয়ে আমাদের ভাববার দরকার নেই।

আবার কেউ কেউ বলেন, প্রাচীনকালে আমেরিকায় অনেকগুলি মহান সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। তুমি জানো, কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন বলে মনে করা হয়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, কলম্বাসের আসার আগে আমেরিকা নামে কোনও দেশ ছিল না। সোজা কথায় এর অর্থ হল, কলম্বাস খুঁজে না যাওয়া পর্যন্ত ইউরোপের লোকেরা আমেরিকার অস্তিত্ব জানত না। কলম্বাসের আসার সুদীর্ঘকাল আগে থেকেই আমেরিকায় মানুষ বসবাস করত এবং তারা একধরনের সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। উত্তর আমেরিকায় মেক্সিকোর ইউকাতান শহরে (Yukatan) এবং দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতে অনেক পুরনো বাড়ির ধ্বংসাবশেষ আমরা দেখতে পাই। এইসব দেখে আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে অতি প্রাচীন কালে পেরু ও ইউকাতানে সভ্য মানুষ বাস করত। তাদের সম্বন্ধে এখন আমরা বিশেষ কিছু জানি না, সেজন্যে তাদের বিষয়ে আর বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়। ভবিষ্যতে হয়তো তাদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য খুঁজে পাওয়া যাবে।

সে সময় ইউরোপ ও এশিয়াকে মিলিতভাবে ইউরেশিয়া বলা হত। সম্ভবত ইউরেশিয়ার মেসোপটেমিয়া, মিশর, ক্রিট, ভারতবর্ষ এবং চিন দেশে প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। মিশর এখন আফ্রিকা মহাদেশের একটি অংশ। কিন্তু মিশর দেশটি আমাদের খুব নিকটে থাকায় একে আমরা ইউরেশিয়ার অন্তর্গত বলে ভাবতে পারি।

প্রাচীন গোষ্ঠীর লোকেরা যারা কেবল নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াত, কোথাও বসতি স্থাপন করতে চাইলে কী ধরনের জায়গা তারা বেছে নেবে? অবশ্যই এ হবে এমন এক জায়গা যেখানে সহজে খাদ্য পাওয়া যাবে।

খাদ্যের একটা অংশ জমি চাষ করে উৎপন্ন হত। চাষবাসের জন্য সবচেয়ে বেশি দরকার জল। জল না পেলে জমি শুকিয়ে যাবে এবং সে জমিতে কিছু জন্মাবে না। তুমি জানো, ভারতে বর্ষাকালে বৃষ্টি না হলে ফসল অনেক কম জন্মায় এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। গরিবদের খাবার মেলে না, তারা অনাহারে থাকে। চাষাবাসের জন্যে সবচেয়ে আগে দরকার জল। একারণে প্রাচীন যুগের মানুষ বসবাসের জন্যে এমনসব জায়গা বেছে নিয়েছিল যেখানে অবশ্যই প্রচুর জল পাওয়া যাবে। সত্যি সত্যি সেই রকমই ঘটেছিল।

মেসোপটেমিয়ায় দুটি বড় নদী টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসের মাঝখানের অঞ্চলে মানুষ বসবাস শুরু করেছিল। মিশরে বসতি করেছিল নীল নদের কাছাকাছি অঞ্চলে। ভারতে বেশির ভাগ শহর গড়ে উঠেছিল সিন্ধু, গঙ্গা ও যমুনা ইত্যাদি বড় বড় নদ-নদীর ধারে। বেঁচে থাকার জন্যে জল একান্ত দরকার বলে লোকে নদীকে পবিত্র মনে করত। নদীর জলের জন্যে তারা সহজে খাদ্য পেত, প্রাচুর্যে জীবন ভরে উঠত। মিশরে নীল নদকে তারা বলতে 'পিতা নীল' (Father Nile) এবং তাকে পুজো করত। তুমি জানো, ভারতে গঙ্গানদীকে পুজো করা হত, এখনও এই নদীকে পবিত্র মনে করা হয়। এই নদীকে 'মা গঙ্গা' (গঙ্গা মাঈ) বলা হয়। তুমি তীর্থযাত্রীদের 'গঙ্গা মাঈ কী জয়' ধ্বনি দিতে শুনবে। এইসব নদী থেকে মানুষ এত রকম সাহায্য পেয়েছে বলেই যে তারা নদীকে পুজো করে থাকে, একথা সহজেই বোঝা যায়। নদী থেকে কেবল জল নয়, পলিমাটি ও বালিও পাওয়া যেত। ফলে জমি হত উর্বর। নদীর জল ও পলিমাটির জন্যে জমিতে প্রচুর ফসল জন্মাত। এজন্যে নদীকে 'বাবা' বা 'মা' বলে ডাকা যেতেই পারে। কী কারণে কোনও কাজ মানুষ করে থাকে, একথা ভুলে যাওয়া তার স্বভাব। কিছু না বুঝে সে অপরের অনুকরণ করে থাকে। অবশ্যই মনে রাখা দরকার নীল নদ ও গঙ্গা নদী মানুষকে জল আর খাদ্য জুগিয়েছে বলেই মানুষ তাদের পবিত্র মনে করে।

AMARBOI.COM

প্রাচীন যুগের বড় বড় শহর

আমরা দেখেছি মানুষ প্রথমে বসতি করেছিল বড় বড় নদীর কাছাকাছি উর্বর জমিতে যেখানে প্রচুর জল আর খাদ্য পাওয়া যায়। তখনকার বড় বড় শহরগুলি ছিল নদীর ধারে। তুমি হয়তো এ রকম কয়েকটি বিখ্যাত পুরনো শহরের নাম শুনে থাকবে। মেসোপটেমিয়ায় ছিল ব্যাবিলন, নিনেভে এবং আসুর। কিন্তু এ শহরগুলি অনেকদিন আগে লুপ্ত হয়ে গেছে। মাটি ও বালি খুঁড়ে অনেক নীচে থেকে এইসব শহরের চিহ্নাবশেষ মানুষ কখনও কখনও খুঁজে পায়। হাজার হাজার বছর ধরে বালি আর মাটি এইসব শহরকে একেবারে ঢেকে ফেলে, তাদের আর কোনও চিহ্ন দেখা যায় না। কোনও কোনও জায়গায় মাটির তলায় চাপা-পড়া এইসব শহরের ওপর নতুন শহরগুলি গড়ে উঠেছে। এইসব শহর খুঁজে বার করার জন্যে মানুষ মাটির অনেক নীচে পর্যন্ত খুঁড়েছে। কখনও কখনও দেখতে পেয়েছে একটি শহরের ওপর পর পর কয়েকটি শহরের চিহ্ন। অবশ্য শহরগুলি একই সময়ে এভাবে ছিল না। একটি শহর হয়তো কয়েক শো বছর টিকে ছিল। সেখানে মানুষ বাস করেছে এবং মারা গেছে। তাদের পরবর্তী বংশধরেরাও বসবাস করেছে এবং মারা গেছে। ধীরে ধীরে শহরটি জনশূন্য হতে থাকে, অল্পলোকেই সেখানে বাস করত। অবশেষে একদিন সেখানে আর কোনও বাসিন্দা রইল না এবং পুরো জায়গাটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। ধুলো বালি উড়ে এসে শহরকে ঢেকে ফেলে, ধুলো বালি সরাবার মতো লোক কেউ ছিল না। বছরের পর বছর দীর্ঘ দিন ধরে পুরো শহরটি ধুলোবালিতে একেবারে চাপা পড়ে গেল। এমনকী লোকে এই শহরের কথা ভুলেও গেল। এর পর শত শত বছর কেটে গেছে। নতুন মানুষের দল সেখানে এসে একটি নতুন শহর গড়ে তোলে। কালের নিয়মে এই শহরটি একদিন পুরনো এবং জনশূন্য হয়ে ধ্বংস হয়ে গেল। সেই শহরও একদিন ধুলোবালির নীচে চাপা পড়ে লুপ্ত হয়ে গেল। এইভাবে কখনও কখনও একটি শহরের ওপর আরও অনেক শহরের ধ্বংসস্তূপ আমরা দেখতে পেয়েছি। যে সব জায়গায় বালি বেশি বিশেষ করে সে রকম জায়গায় এরকম ঘটেছিল, কারণ বালি খুব তাড়াতাড়ি সবকিছু চাপা দিয়ে ফেলে।

ভাবতে অবাক হতে হয়, এভাবে একের পর এক শহর গড়ে উঠবে, কত নরনারী শিশুকে আশ্রয় দেবে এবং ধীরে ধীরে আবার অদৃশ্য হয়ে যাবে। পুরনো শহরের জায়গায় কত নতুন শহর গড়ে ওঠে, সেখানে দলে দলে নতুন মানুষ এসে বাস করতে থাকে। এই শহরগুলিও একদিন লুপ্ত হয়ে যায়। তাদের কোনও চিহ্নই থাকে না। মাত্র কয়েক লাইনে এইসব শহরের কথা বলছি বটে, কিন্তু ভেবে দেখো একটি শহর গড়ে উঠতে এবং তা লুপ্ত হতে এবং পরে তাদের জায়গায় আবার নতুন কোনও শহর গড়ে উঠতে সময় লেগেছে কত হাজার হাজার বছর। মানুষের বয়স সত্তর বা আশি বছর হলে তাকে বুড়ো বলা হয়। কিন্তু এই হাজার হাজার বছরের কথা ভাবলে সত্তর বা আশি বছর কতটুকুই বা সময়। এইসব শহর যখন টিকেছিল তখন এখানে একের পর এক কত শিশু বয়স বেড়ে বুড়ো হয়েছে এবং পরে মারা গেছে। ব্যাবিলন এবং নিনেভে এখন আমাদের কাছে দুটি নাম মাত্র।

AMARBOI.COM

আর একটি পুরনো শহর হল দামাস্কাস। এ শহরটি কিন্তু লুপ্ত হয়নি। দামাস্কাস এখনও আছে এবং তা খুব বড় শহর। কেউ কেউ বলেন দামাস্কাস সম্ভবত বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো শহর।

ভারতে বড় বড় শহরগুলিও নদীর ধারে গড়ে উঠেছিল। পুরনো শহরের মধ্যে একটি হল ইন্দ্রপ্রস্থ। এটি দিল্লির কাছাকাছি কোনও এক জায়গায় ছিল। কিন্তু ইন্দ্রপ্রস্থ এখন আর নেই। বারাণসী বা কাশীও খুব পুরনো শহর। যে সব পুরনো শহর আজও পৃথিবীতে টিকে আছে কাশী সম্ভবত তাদের একটি। এলাহাবাদ, কানপুর, পাটনা এবং এরকম আরও কয়েকটি শহরের কথা তোমার মনে পড়বে। এ শহরগুলিও রয়েছে নদীর ধারে। কিন্তু এগুলি খুব পুরনো শহর নয়। প্রয়াগ ও পাটলিপুত্র, যাদের এখন এলাহাবাদ এবং পাটনা বলা হয়, শহর দুটি অবশ্য বেশ পুরনো শহর।

চিন দেশেও অনেক পুরনো শহর আছে।

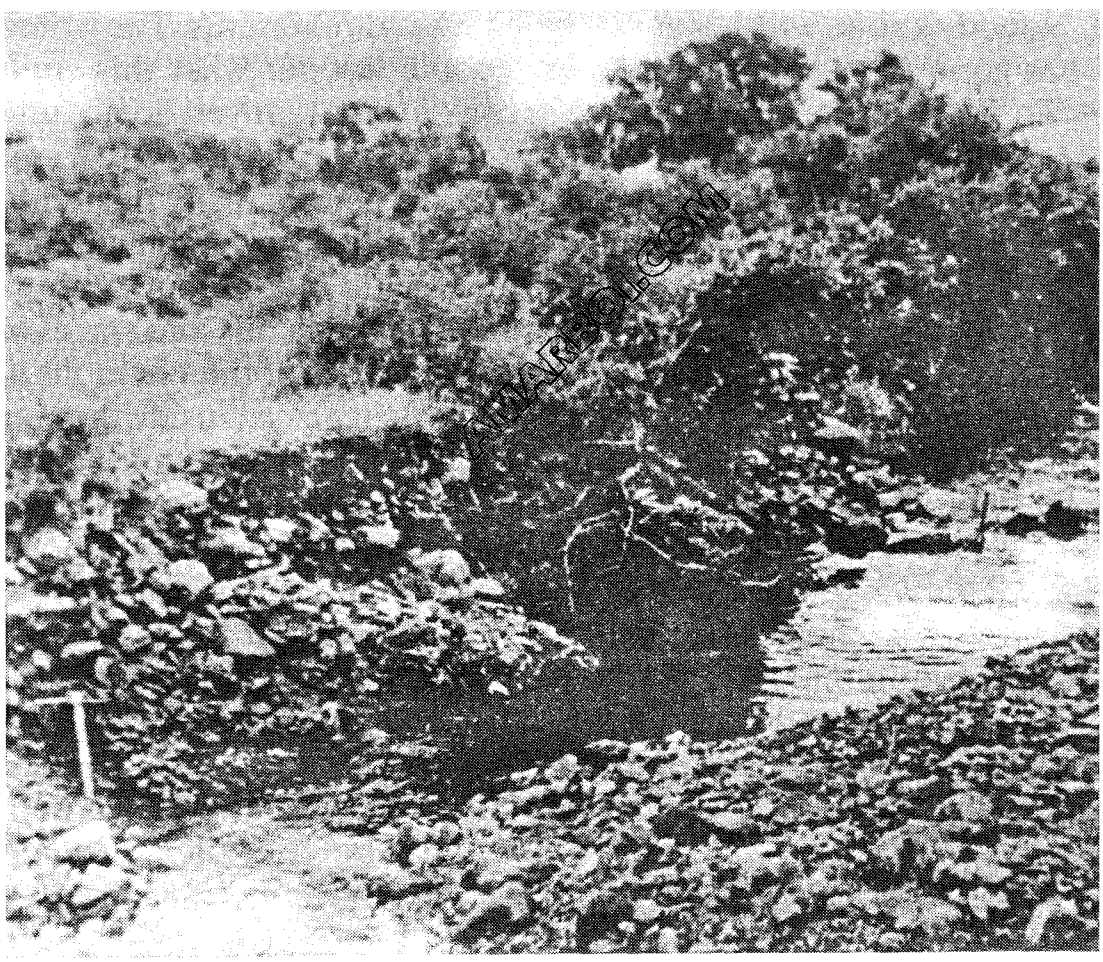

১৯৫৬ সালে আবিষ্কৃত প্রস্তরযুগের একটি স্থান। Sanwan নদীর উত্তরদিকের দৃশ্য

মিশর এবং ক্রিট

প্রাচীন কালের গ্রামে ও শহরে কী ধরনের মানুষ বাস করত? তখনকার মানুষ যে সব বড় বড় বাড়ি এবং অনেক বাড়ির কাঠামো তৈরি করেছিল সেগুলি দেখে আমরা তাদের সম্বন্ধে কিছু জানতে পারি। সে যুগের শিলালিপি থেকেও কিছু জানা যায়। এ ছাড়া কয়েকটি খুব পুরনো বই বা পুঁথি আছে যা পড়ে আমরা সে সময়কার অনেক তথ্য জানতে পেরেছি।

মিশরে এখনও আমরা পিরামিড আর স্ফিংকস, লাক্সার ও অন্য কয়েকটি জায়গায় বিশাল সব মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাই। তুমি সেগুলি দেখনি। সুয়েজ খাল দিয়ে আমরা যখন যাচ্ছিলাম সে সময় এগুলি আমাদের কাছ থেকে খুব একটা দূরে ছিল না। তুমি এদের ছবি দেখে থাকবে। তোমার কাছে হয়তো ছবির পোস্টকার্ডও আছে। স্ফিংকসের দেহটা সিংহের, মাথা স্ত্রীলোকের। কেউ জানে না এটা কেন তৈরি হয়েছিল আর এ কী বলতে চাইছে। স্ত্রীলোকটির মুখে এক রহস্যময় মৃদু হাসি লেগে আছে। মানুষ ভেবে পায় না এই হাসির অর্থ কী। কোনও লোক স্ফিংকসের মতো, একথা বলার অর্থ সেই মানুষটিকে তুমি বুঝতে পারছ না।

পিরামিডের আকারও খুব বিরাট। আসলে এগুলি হল মিশরের প্রাচীন রাজাদের সমাধি। মিশরের রাজাদের বলা হত ফ্যারাও। লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে মিশরের কয়েকটি মমি দেখেছিলে মনে পড়বে। মমি হল কোনও মানুষ বা জন্তুর মৃতদেহ, যা তেল ও মশলা মাখিয়ে রাখা হত যাতে সেগুলি পচে গলে নষ্ট না হয়। ফ্যারাওদের মৃত্যু হলে তাদের সেই এভাবে মমি করে বড় বড় পিরামিডের ভেতরে রেখে দেওয়া হত। মমির কাছে সোনা রুপোর গয়না, আসবাবপত্র এবং খাদ্য রেখে দেওয়া হত। মানুষ ভাবত এইসব জিনিস মৃত্যুর পরেও ফ্যারাওদের দরকার লাগবে। দু-তিন বছর আগে এরকম একটি পিরামিডের মধ্যে কয়েকজন লোক টুটেনখামেন নামে এক ফ্যারাওয়ের মমি খুঁজে পেয়েছিল। মমির কাছে অনেক সুন্দর এবং দামি জিনিস রাখা ছিল।

সে যুগে মিশরেও জমিতে জলসেচ এবং চাষবাসের জন্যে লোকে বড় বড় খাল এবং হ্রদ খনন করেছিল। এদের মধ্যে মেরিদু নামে হ্রদটি বিখ্যাত। এ থেকে বুঝতে পারা যায় প্রাচীন মিশরের লোক কত বুদ্ধিমান ও উন্নত ছিল। তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই অনেক দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার ছিল। এরাই খাল ও হ্রদ খনন এবং পিরামিড তৈরি করেছিল।

ক্রিট বা ক্যানডিয়া ভূমধ্যসাগরের একটি ছোট দ্বীপ। পোর্ট সৈয়দ থেকে ভেনিস যাবার পথে আমরা এই দ্বীপের কাছ দিয়ে গিয়েছিলাম। প্রাচীন কালে এই ছোট দ্বীপে একটি উন্নত সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। ক্রিটের নসস-এ একটি বিশাল প্রাসাদ ছিল, এখনও তার ধ্বংসাবশেষ আমরা দেখতে পাই। এই প্রাসাদে অনেক স্নানের ঘর এবং জল-নিকাশির পাইপ ছিল, যা দেখে কিছু অজ্ঞ লোক মনে করে এগুলি এযুগের তৈরি। এ ছাড়া ছিল সুন্দর মাটির পাত্র, ভাস্কর্য এবং ছবি, হাতির দাঁত ও ধাতু দিয়ে তৈরি নানা সুন্দর জিনিস। এই ছোট দ্বীপে মানুষ শান্তিতে বাস করত এবং তারা জীবনে খুব উন্নতি করেছিল।

AMARBOI.COM

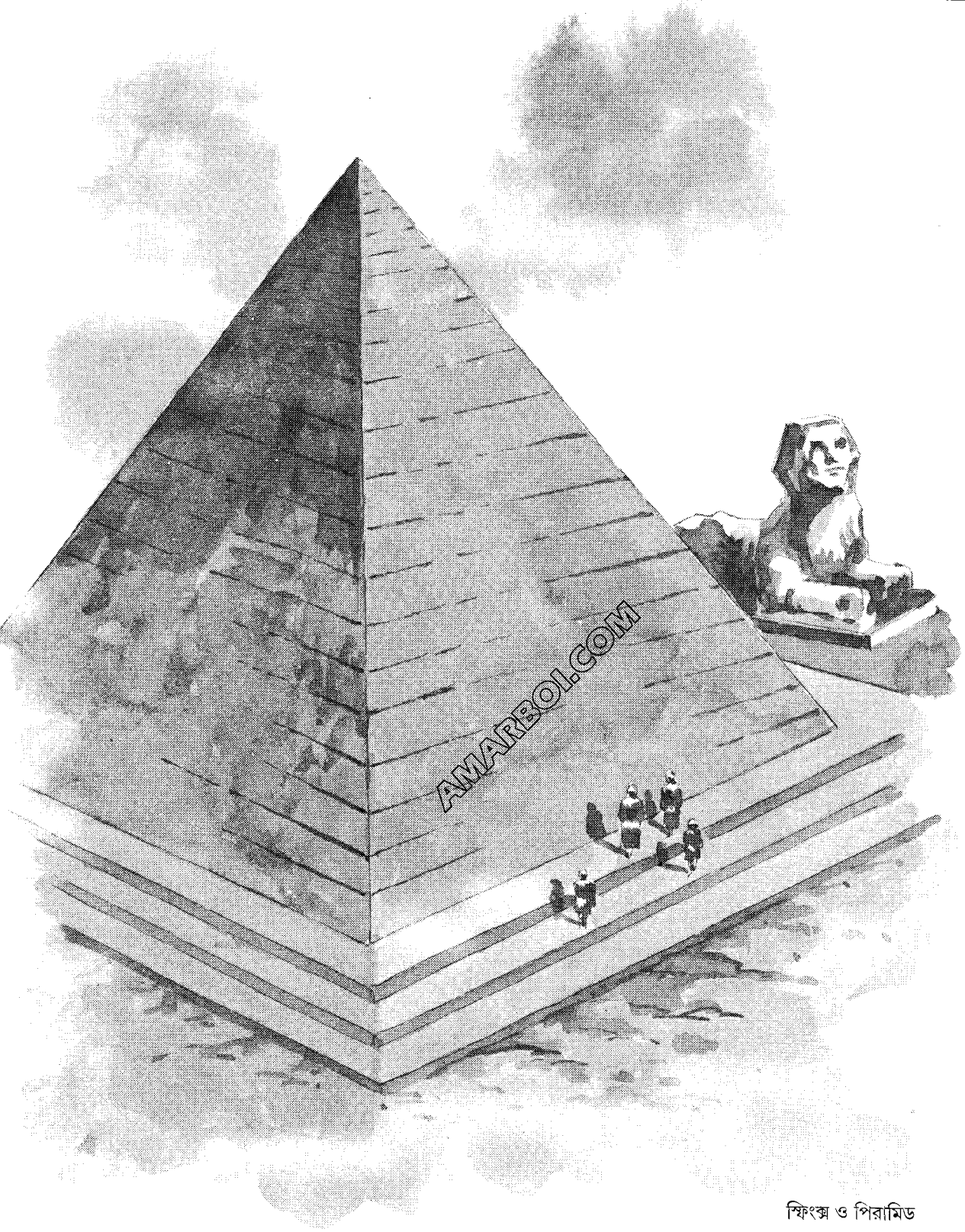

AMARBOI.COM

স্ফিংক্স ও পিরামিড

তুমি নিশ্চয় রাজা মিডাসের গল্প পড়েছ। যা কিছু তিনি ছুঁতেন তা সোনা হয়ে যেত বলে মিডাস মহা বিপদে পড়েছিলেন। তিনি কিছু খেতে পারতেন না, কারণ তাঁর খাবার সোনা হয়ে যেত। সোনা তো আর খাওয়া যায় না। নিজের লোভের জন্যে তিনি শাস্তি পেয়েছিলেন। এ অবশ্য একটি কাল্পনিক গল্প। আসলে এ থেকে আমরা শিখতে পারি, সোনাকে মানুষ যত সুন্দর ও দামি মনে করে আসলে সোনা কিন্তু সে রকম জিনিস নয়।

ক্রিটের আর একটি গল্প আছে, তুমি হয়তো তা শুনেছ। মিনোটার নামে এক দৈত্যকে নিয়ে এই গল্প। মিনোটারের দেহ ছিল অর্ধেক মানুষ অর্ধেক ষাঁড়। এই দৈত্যের কাছে তার খাদ্য হিসেবে যুবক-যুবতীদের

পাঠানো হত। আগেই বলেছি কোনও এক অজানা শক্তির কথা ভেবে মানুষ ভয় পেয়েছিল এবং সেই ভয় থেকে তার মনে ধর্মবোধ প্রথম দেখা দিয়েছিল। ভয় পেয়ে প্রকৃতিতে বা চারপাশে যা ঘটে তার কারণ বুঝতে না পেরে মানুষ নির্বোধের মতো অনেক কাজ করত। এভাবে কোনও এক কাল্পনিক দৈত্যের উদ্দেশে মানুষ ছেলেমেয়েদের বলি দিত। আমার তো মনে হয় না এধরনের সত্যিকার কোনও দৈত্য ছিল।

প্রাচীন কালে পৃথিবীর সব জায়গায় নরবলি প্রথা ছিল। এর অর্থ হল, যে সব কাল্পনিক শক্তিকে মানুষ পুজো করত তাদের উদ্দেশে স্ত্রী-পুরুষকে হত্যা করে নিবেদন করা। মিশরে নীল নদের জলে মেয়েদের বিসর্জন দেওয়া হত। মনে করা হত এতে পিতা নীল (Father Nile) সন্তুষ্ট হবেন।

আনন্দের কথা, পৃথিবী থেকে এখন নরবলি উঠে গেছে। তবে পৃথিবীর কোনও দূর প্রান্ত থেকে ক্বচিৎ কখনও নরবলির কথা শোনা যায়। কিছু লোক অবশ্য এখনও দেবতাকে খুশি করতে পশু বলি দিয়ে থাকে। কাউকে পুজো করার এ এক অদ্ভুত রীতি।

চিন এবং ভারতবর্ষ

আমরা দেখেছি মেসোপটেমিয়া, মিশর এবং ভূমধ্যসাগরের ছোট দ্বীপ ক্রিটে সভ্যতার উন্মেষ এবং বিকাশ ঘটেছিল। প্রায় সেই একই সময়ে চিন এবং ভারতবর্ষেও মহান সভ্যতার উদ্ভব হয় এবং তা নিজস্ব ধারায় উন্নত হতে থাকে।

অন্যান্য দেশের মতো চিনেও বড় বড় নদীর ধারে মানুষ বসতি স্থাপন করেছিল। এইসব মানুষকে বলা হত মঙ্গোল। তারা প্রথমে ব্রোঞ্জ এবং পরে লোহা দিয়ে সুন্দর সুন্দর পাত্র তৈরি করত। তারা অনেক খাল খনন করেছিল এবং সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করেছিল। তারা এক নতুন ধরনের লেখার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিল। হিন্দি, ইংরেজি বা উর্দুতে লেখার পদ্ধতি থেকে এই পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। এ একধরনের চিত্রলিখন। প্রতিটি শব্দ এবং কখনও কখনও একটি ছোট বাক্য ছবি এঁকে বোঝানো হত। প্রাচীন মিশর, ক্রিট ও ব্যাবিলনেও এধরনের ছবি দিয়ে লেখার প্রচলন ছিল। এই পদ্ধতিকে এখন বলা হয় হাইঅ্যারোগ্লিফিক (hieroglyphic) লিপি। মিউজিয়ামে এবং কোনও কোনও বইয়ে তুমি এ ধরনের লেখা দেখে থাকবে। মিশরে এবং পাশ্চাত্য দেশে খুব পুরনো বাড়ির দেয়ালে এ ধরনের লেখা দেখতে পাওয়া যায়। দীর্ঘকাল সেখানে এই পদ্ধতিতে কেউ লেখে না। কিন্তু চিনে এখনও ছবি আঁকার পদ্ধতিতে লেখা হয়। এই লেখা উপর থেকে শুরু হয়ে নীচের দিকে নেমে আসে; হিন্দি বা ইংরেজির মতো ডান দিক থেকে বাঁ দিকে কিংবা উর্দুর মতো বাঁ দিক থেকে ডান দিকে নয়।

ভারতে অনেক পুরনো বাড়ির ধ্বংসাবশেষ হয়তো এখনও মাটি ও বালির নীচে চাপা পড়ে আছে। কেউ মাটি খুঁড়ে বার না করায় সেগুলি আমাদের কাছে অজানা রয়ে গেছে। উত্তর ভারতে ইতিমধ্যে কিছু ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেছে। আমরা জানি বহু বহু যুগ আগে, এমনকী ভারতে আর্যদের আসারও আগে, এখানে দ্রাবিড়রা বসবাস করত। তাদের সভ্যতা ছিল অতি উন্নত। অন্য দেশের সঙ্গে তারা ব্যবসা করত। নিজেদের তৈরি অনেক জিনিস তারা মেসোপটেমিয়া ও মিশরে রপ্তানি করত। সমুদ্রপথে অন্য দেশে তারা বিশেষ করে পাঠাত চাল, গোলমরিচ ধরনের নানা মশলা এবং সেগুন কাঠ। এই কাঠ দিয়ে বাড়িঘর তৈরি হত। মেসোপটেমিয়া উর শহরে (Ur) সেগুন কাঠের তৈরি কয়েকটি বড় প্রাসাদ আছে। বলা হয়, এই কাঠ এসেছিল দক্ষিণ ভারত থেকে। আরও বলা হয়, সোনা, মুক্তো, হাতির দাঁত, ময়ূর এবং বানর ভারত থেকে পশ্চিমের দেশগুলিতে পাঠানো হত। কাজেই দেখা যাচ্ছে, সে সময় ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশের বেশ ভালভাবে ব্যবসাবাণিজ্য চলত। কোনও জাতি সভ্য এবং উন্নত হলেই তার পক্ষে ব্যবসাবাণিজ্য করা সম্ভব।

সে সময় ভারত এবং চিন দেশে অনেক ছোট ছোট রাষ্ট্র বা রাজ্য ছিল। এই দুটি দেশের কোনটিই একটিমাত্র সরকারের অধীনে ছিল না। এক একটি ছোট শহরের সঙ্গে কয়েকটি গ্রাম এবং কিছু জমি জায়গা নিয়ে এক একটি পৃথক সরকার গড়ে উঠেছিল। এগুলিকে বলা হত নগর-রাষ্ট্র। প্রাচীন যুগেও এরকম অনেকগুলি রাষ্ট্র ছিল প্রজাতান্ত্রিক। সেখানে কোনও রাজা ছিল না, জনসাধারণের নির্বাচিত পঞ্চায়েত রাজ্য

শাসন করত। কতকগুলি অবশ্য ছোট ছোট রাজ্য ছিল। যদিও নগর-রাষ্ট্রগুলির প্রত্যেকের পৃথক সরকার ছিল, কিন্তু সময় সময় তারা একে অন্যকে সাহায্য করত। কখনও বা একটি বড় রাষ্ট্র অনেকগুলি ছোট রাষ্ট্রের নেতা হয়ে উঠেছিল।

চিন দেশে ছোট ছোট রাজ্যগুলির জায়গায় শীঘ্রই একটি বড় রাষ্ট্র অর্থাৎ সাম্রাজ্য গড়ে উঠল। এই সাম্রাজ্যের যুগে চিনে মহাপ্রাচীর নির্মাণ করা হয়। এই মহাপ্রাচীরের কথা তুমি বইয়ে পড়েছ। কী বিশাল এই প্রাচীর! মঙ্গোলরা যাতে চিনে ঢুকতে না পারে সেজন্যে সমুদ্রতীর থেকে শুরু করে উত্তর দিকে উঁচু পাহাড় পর্যন্ত এই প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছিল। এই প্রাচীর ১৪০০ মাইল লম্বা, ২০ থেকে ৩০ ফুট উঁচু এবং ২৫ ফুট চওড়া। কিছু দূর অন্তর অন্তর ছিল দুর্গ ও নজরদারি-মিনার। এ ধরনের কোনও প্রাচীর ভারতে তৈরি হলে তা উত্তরে লাহোর থেকে দক্ষিণে মাদ্রাজ পর্যন্ত বিস্তৃত হত। এই মহাপ্রাচীর আজও দাঁড়িয়ে আছে। যদি তুমি চিনে কখনও যাও সেটি দেখতে পাবে।

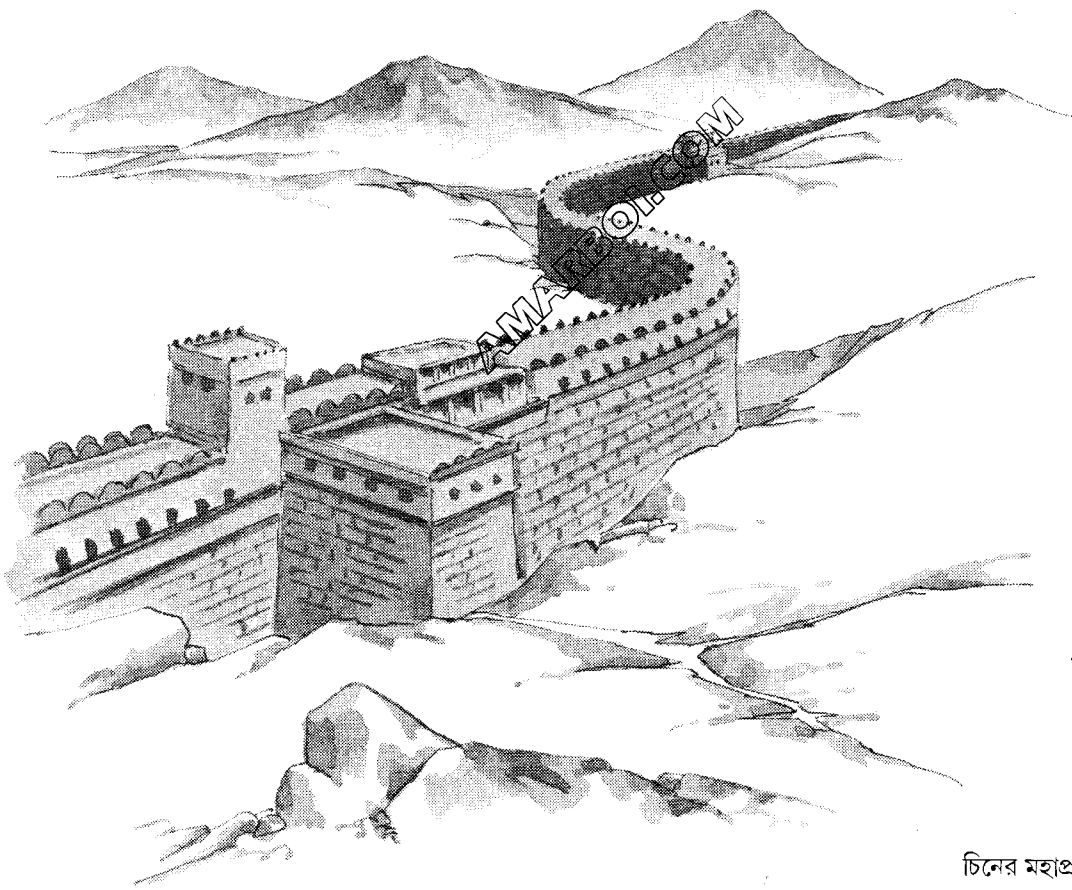

চিনের মহাপ্রাচীর

সমুদ্রযাত্রা এবং বাণিজ্য

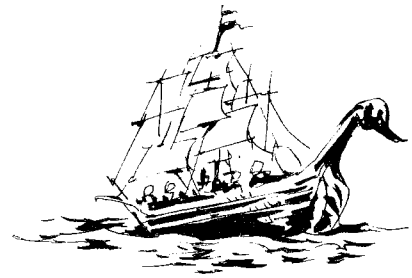

প্রাচীন কালের আর এক উল্লেখযোগ্য জাতি হল ফিনিশীয়ার মানুষ। ইহুদি ও আরবরা যে-জাতির মানুষ এরাও সেই জাতির। এরা বিশেষ করে এশিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূলে বাস করত। এই জায়গাটিকে এখন তুরস্ক বলা হয়। ভূমধ্যসাগরের তীরে এ্যাকার, টায়ার ও সীডন ছিল এদের প্রধান শহর। ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সমুদ্রপথে বহুদূর দেশে যাওয়ার জন্যে তাদের খ্যাতি ছিল। তারা ভূমধ্যসাগরের তীরে সব জায়গায় এবং এমনকী ইংল্যাণ্ড পর্যন্ত যাতায়াত করত। তারা হয়তো ভারতেও এসেছিল।

এখন আমরা দুটি খুব বড় ঘটনার সূচনা দেখতে পাই—সমুদ্রযাত্রা এবং বাণিজ্য। একটি অপরকে সাহায্য করত। এখন তুমি যেমন সুন্দর সুন্দর জাহাজ দেখতে পাও সে সময়ে অবশ্য তা ছিল না। গাছের গুঁড়ি কুঁদে প্রথমে নৌকো তৈরি করা হয়েছিল। সেগুলি কখনও দাঁড় টেনে চালানো হত, কখনও বা চলত পালের হাওয়ার টানে। সে সময় সমুদ্রযাত্রা ছিল খুব রোমাঞ্চকর এবং উত্তেজনার ব্যাপার। কল্পনা করে দেখ, পাল-তোলা একটি ছোট নৌকোয় দাঁড় টেনে তুমি আরব সাগর পাড়ি দিয়েছ। তাতে নড়াচড়া করার মতো জায়গা বিশেষ থাকত না। সামান্য একটু জোরে হাওয়া দিলে নৌকো দোল খেত এবং মাটিতে আটকে যেত; এবং প্রায়ই ডুবে যেত। সাহসী লোকেরাই কেবল নৌকো করে উন্মুক্ত সমুদ্রে পাড়ি দেবার ঝুঁকি নিতে পারে। সমুদ্রযাত্রার তখন পদে পদে বিপদ, মাসের পর মাস ডাঙা চোখে পড়বে না। খাবার ফুরিয়ে গেলে মাঝ সমুদ্রে মাছ বা পাখি ধরে খাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। সমুদ্রযাত্রা ছিল এক দুঃসাহসিক এবং রোমাঞ্চকর অভিযান। প্রাচীন কালে সমুদ্রে নাবিকদের এবং আরও অদ্ভুত সব ঘটনা নিয়ে অনেক গল্প আছে।

কিন্তু বিপদের ঝুঁকি নিয়েও মানুষ সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছে। দুঃসাহসিক কাজ ভালবাসত বলে কেউ হয়তো বেরিয়ে পড়ত, কিন্তু বেশির ভাগই যেত সোনা আর টাকা পাওয়ার লোভে। তারা যেত ব্যবসা করতে, জিনিসপত্র বেচা-কেনা করতে। এভাবে তারা অনেক টাকাপয়সা করেছিল।

ব্যবসা কাকে বলে এবং কীভাবে তা শুরু হয়েছিল? তুমি এখন বড় বড় দোকান দেখতে পাও, সেখানে ঢুকে ইচ্ছেমতো জিনিসপত্র তুমি কত সহজে কিনতে পার। কখনও কি ভেবে দেখেছ, এইসব জিনিস আসে কোথা থেকে? এলাহাবাদের কোনও দোকানে তুমি একটা পশমি শাল কিনতে পার। এই শালটি এসেছে কাশ্মীর থেকে আর এই শালের পশম তৈরি হয়েছে কাশ্মীর ও লাডাকের পাহাড়ি অঞ্চলের ভেড়ার লোম থেকে। যে টুথপেস্ট তুমি কিনছ সেটি হয়তো এসেছে ট্রেন এবং জাহাজে বহু পথ ঘুরে সুদূর আমেরিকা থেকে। এভাবেই তুমি চিন, জাপান, প্যারিস বা লণ্ডনের তৈরি জিনিসপত্র কিনতে পার। এখানকার বাজারে যে বিলিতি কাপড় বিক্রি হচ্ছে তার কথা ভেবে দেখা যাক। তুলো জন্মায় ভারতে এবং তা পাঠানো হয় ইংল্যাণ্ডে। একটি বড় কাপড়ের মিল সেই তুলো কিনে, পরিষ্কার করে সুতো তৈরি করে এবং তারপরে সেই সুতো থেকে কাপড় তৈরি করে। এই কাপড় এরপর ভারতে আসে এবং এখানকার বাজারে বিক্রি হয়। কাপড় বাজারে বিক্রি হওয়ার আগে পর্যন্ত তুলো কত হাজার মাইল আসা-যাওয়া করেছে। ভারতে যে

AMARBOI.COM

তুলো জন্মায় তা ইংল্যাণ্ডে নিয়ে যাওয়া হল কাপড় তৈরির জন্যে এবং সেখান থেকে তা আবার কাপড় হয়ে ফিরে এল। পুরো ব্যাপারটা অর্থহীন মনে হতে পারে। এতে সময়, টাকা এবং শ্রমের কত অপচয় হচ্ছে। এই তুলো থেকে ভারতে কাপড় তৈরি হলে তা অনেক ভালো ধরনের হত এবং খরচও পড়ত অনেক কম। তুমি জানো, আমরা কোনও বিদেশি কাপড় কিনি না বা পরি না। আমরা খদ্দর পরি কারণ যতদূর সম্ভব নিজের দেশের তৈরি জিনিস কেনা বুদ্ধিমানের কাজ। আমাদের খদ্দর কেনা এবং পরার আর একটা কারণ হল, যে সব গরিব মানুষ সুতো কেটে কাপড় বুনছে তাদের আমরা এভাবে সাহায্য করতে পারি।

কাজেই দেখতে পাচ্ছ ব্যবসা ব্যাপারটা এখন বেশ জটিল হয়ে পড়েছে। সব সময়ে বড় বড় জাহাজে করে এক দেশ থেকে অন্য দেশে জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আগে কিন্তু এরকম সুবিধা ছিল না।

একেবারে প্রথম দিকে মানুষ যখন বসতি স্থাপন করেছিল তখন ব্যবসা ছিল না বললেই হয়। যা কিছু দরকার তা সে নিজে জোগাড় করত কিংবা তৈরি করত। তার চাহিদাও তখন বেশি ছিল না। তারপর, আগেই যা বলেছি, গোষ্ঠীর সকলের মধ্যে কাজ ভাগ করে দেওয়া হয়। মানুষ বিভিন্ন রকমের কাজ করে নানান ধরনের জিনিস তৈরি করত। কখনও কখনও এমন ঘটেছে, কোনও একটি গোষ্ঠীর হাতে কোনও একধরনের জিনিস অনেক বেশি আছে এবং অপর এক গোষ্ঠীর হাতে তেমনি বেশি আছে আর একধরনের জিনিস। কাজেই জিনিস অদল-বদল করাটাই ছিল তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। এক বস্তা শস্যের বদলে একটি গোষ্ঠী হয়তো একটি গোরু দিত। তখন টাকাকড়ির চলন ছিল না। কেবল একটি জিনিসের বদলে আর একটি জিনিস পাওয়া যেত। এভাবে সমাজে বিনিময় প্রথা চালু হয়। এতে অবশ্য অনেক অসুবিধা ছিল। এক বস্তা শস্য বা ওই রকম কোনও জিনিস পেতে হলে একটি গোরু বা হয়তো কয়েকটি ভেড়া সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হয়। এ সত্ত্বেও ব্যবসার উন্নতি ঘটতে থাকে।

সোনা বা রুপো আবিষ্কারের পর মানুষ সেগুলি ব্যবসার কাজে ব্যবহার করতে শুরু করে। এগুলিকে বেশ সহজে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া যেত। ধীরে ধীরে সোনা ও রুপো দিয়ে জিনিস কেনার প্রথা চালু হল। যে মানুষ প্রথম এই প্রথার কথা ভেবেছিলেন তিনি নিশ্চয়ই খুব বুদ্ধিমান। সোনা-রুপোর ব্যবহারের ফলে ব্যবসা আরও সহজ হল। তখনও কিন্তু এখনকার মতো মুদ্রা চালু হয়নি। দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে সোনা আরেক জনকে দেওয়া হত। মুদ্রা চালু হয় অনেক পরে। এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং জিনিসপত্র অদল-বদল করা আরও সহজ হয়। তখন আর দাঁড়পাল্লায় ওজন করার দরকার হল না কারণ মুদ্রার মূল্য কী তা সবাই জানত। এখন সব জায়গায় মুদ্রা ব্যবহার করা হয়। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে টাকার নিজের কোনও মূল্য নেই। আমাদের যে সব জিনিস দরকার তা পেতে টাকা আমাদের সাহায্য করে। টাকার বদলে আমরা জিনিসপত্র পাই। রাজা মিডাসের গল্প তোমার মনে পড়বে। তাঁর প্রচুর সোনা ছিল কিন্তু খাদ্যবস্তু কিছুই ছিল না। সেজন্যে আমাদের যে জিনিস দরকার তা যদি টাকা দিয়ে না পাওয়া যায় তাহলে টাকার কোনও সার্থকতা নেই।

তুমি দেখবে এখনও গ্রামের মানুষ জিনিসের দাম টাকায় না দিয়ে জিনিসপত্র অদল-বদল করে থাকে। কিন্তু টাকা ব্যবহার করা অনেক সুবিধাজনক বলেই মানুষ সাধারণত টাকা ব্যবহার করে থাকে। কিছু নির্বোধ লোক মনে করে যে টাকা এক মূল্যবান জিনিস। এবং তারা টাকা ব্যবহার না করে তা শুধু জমিয়ে রাখে। এ থেকে প্রমাণ হয়, নির্বোধের দল জানে না যে টাকা আসলে কী এবং কীভাবে তার ব্যবহার চালু হয়।

ভাষা, লিপি এবং সংখ্যা

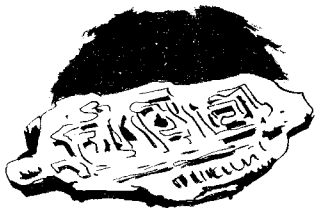

বিভিন্ন ভাষা এবং তাদের একটির সঙ্গে আরেকটির কী সম্পর্ক সে বিষয়ে আমরা আগে আলোচনা করেছি। এবার বলব কীভাবে ভাষার উৎপত্তি হল। জন্তু জানোয়ারদের মধ্যে দেখা যায় তারা কয়েকটি শব্দ করে থাকে। বলা হয়, সাধারণ ব্যাপার বোঝাতে বানর এক ধরনের চিৎকার বা শব্দ করে থাকে। তুমিও লক্ষ্য করে থাকবে, ভয় পেলে কিংবা কোনও বিপদ থেকে অন্যদের সাবধান করার জন্যে জন্তুরা বিশেষ এক ধরনের চিৎকার করে।

মানুষের জীবনেও বোধ হয় এভাবে ভাষার সূচনা হয়েছিল। প্রথম দিকে ভাষা বলতে বোঝাত সাধারণভাবে কিছু চিৎকার—ভয় পেয়ে বা অন্যদের সতর্ক করতে মানুষ নিছক যেমন চেঁচাত। তারপর এল পরিশ্রমের কাজ করার সময় মুখে যে শব্দ করা হয় সেই শব্দ। সবাই মিলে যখন কোনও কাজ করে তখন সকলে একসঙ্গে মুখে একধরনের আওয়াজ করে থাকে। লোককে একসঙ্গে কিছু টেনে নিয়ে যেতে কিংবা খুব ভারী কোনও জিনিস তুলতে কি দেখনি? মনে হয় একসঙ্গে চিৎকার করলে কাজটি কেমন যেন সহজে করা যায়। মনে হয়, কঠিন কোনও কাজ করার সময় ওই রকম চিৎকার হল মানুষের মুখের প্রথম শব্দ।

ধীরে ধীরে আরও অনেক সহজ শব্দের প্রচলন হল। যেমন, জল, আগুন, ঘোড়া, ভালুক। সে যুগে সম্ভবত কেবল বিশেষ্যপদ ব্যবহার করা হত, কোনও ক্রিয়াপদ ছিল না। যদি কেউ বলতে চাইত, সে একটি ভালুক দেখেছে সে মুখে কেবল 'ভালুক' শব্দটি উচ্চারণ করত এবং ছোট ছেলের মতো আঙুল দিয়ে সেটি দেখাত। পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা বিশেষ হত না।

ভাষার বিকাশ ঘটতে থাকে। প্রথমে ছোট বাক্য এবং পরে বড় বাক্য বলা হতে থাকে। সম্ভবত কোনও সময়েই বিভিন্ন ধরণের সব মানুষ একই ভাষায় কথা বলত না। কিন্তু অন্য সময়েও বিভিন্ন ধরনের ভাষার ব্যবহার ছিল না। তোমাকে আগে বলেছি তখন মাত্র কয়েকটি ভাষা ছিল এবং প্রতিটি ভাষা থেকে একটি বৃহৎ ভাষাগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল।

সভ্যতার প্রথম যুগে, যে সময়ের কথা আলোচনা করছি, ভাষা অনেক উন্নত হয়েছে। অনেক গান লেখা হয়েছিল, চারণ গায়কেরা সে সব গান গেয়ে বেড়াত। সে সময় কিছু লিখে রাখার অভ্যাস বা বই ছিল না। মানুষকে অনেক কিছু মনে করে রাখতে হত। ছড়া এবং কবিতা মনে রাখা অনেক সহজ। কাজেই দেখতে পাই, যে সব দেশে প্রথম সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল, সেখানকার মানুষ ছড়া এবং গাথা-গান শুনতে খুব ভালবাসত।

চারণ গায়কের দল বিশেষ করে মৃত বীর পুরুষদের কীর্তিকাহিনী নিয়ে গান গাইতে ভালবাসত। তখনকার মানুষ যুদ্ধ করতে ভালবাসত এবং সেজন্যে যুদ্ধের বীরত্বের ঘটনা নিয়ে গান লেখা হত। ভারতে এবং অন্যান্য দেশে আমরা একই ব্যাপার দেখতে পাই।

কীভাবে লিপির উদ্ভব হল এ ব্যাপারটিও খুব রোমাঞ্চকর। চিনা ভাষায় লেখার পদ্ধতির কথা আগে

AMARBOI.COM

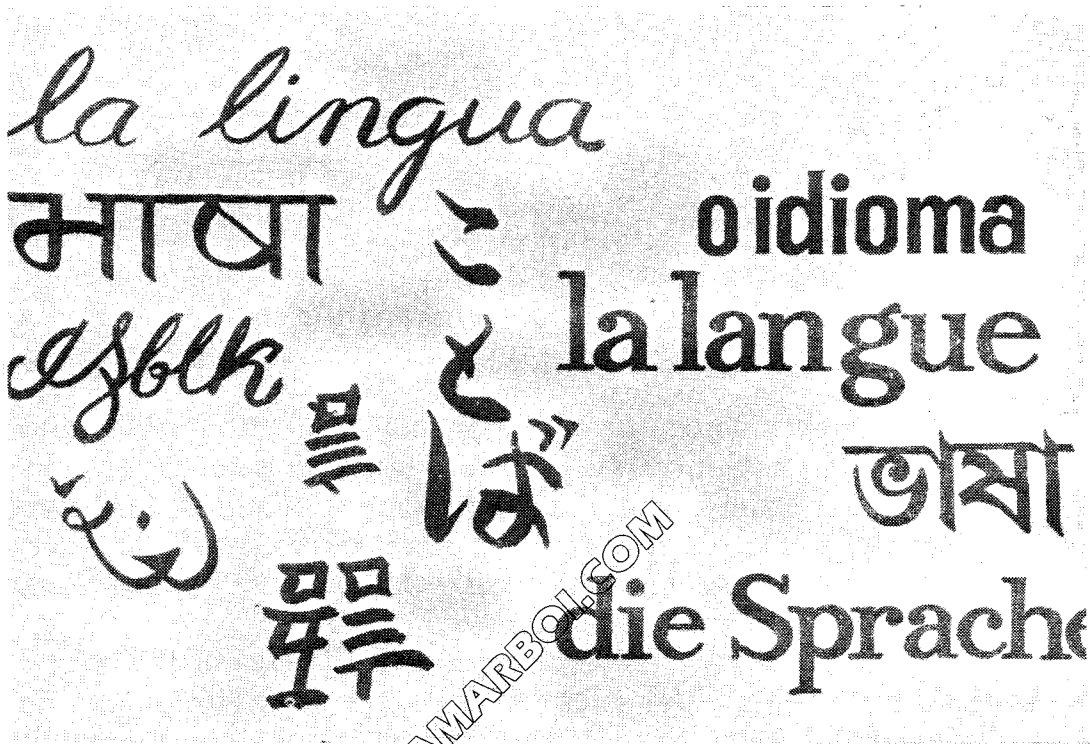

AMARBOI.COM

বলেছি। সমস্ত লেখাই মনে হয় শুরু হয়েছিল ছবি এঁকে। ময়ূর সম্বন্ধে কেউ কিছু বলতে চাইলে সে ময়ূরের একটি ছবি বা নক্‌শা আঁকত। কেউ অবশ্য এভাবে বেশি ছবি আঁকতে পারত না। আস্তে আস্তে ছবিগুলি আরও সহজ হয়ে আসে। এর আরও পরে মানুষ বর্ণমালার কথা চিন্তা করে এবং বর্ণমালা সৃষ্টি করে। এর ফলে লেখার পদ্ধতি অনেক সহজ হল এবং মানুষ দ্রুতগতিতে উন্নতি করতে থাকে।

সংখ্যা এবং গণনা পদ্ধতি জানা মানুষের একটি বড় আবিষ্কার। সংখ্যার ধারণা আসার আগে মানুষ কীভাবে ব্যবসা করত তা কল্পনা করা কঠিন। যে ব্যক্তি এই সংখ্যা আবিষ্কার করেছিলেন তিনি শুধু বুদ্ধিমানই নন, একজন প্রতিভাবান পুরুষ। ইউরোপে প্রথমে যে সংখ্যার চল হয় সেগুলি দেখতে ছিল কেমন জবড়জঙ্গ। রোমান সংখ্যা কাকে বলে তা তুমি জানো। যেমন, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X ইত্যাদি। এগুলি দেখতে বেমানান এবং লেখাও বেশ শক্ত। সমস্ত ভাষায় এখন যে সংখ্যা ব্যবহার করা হয় তা অনেক উন্নত ধরনের। আমি বলছি 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ইত্যাদি সংখ্যার কথা। ইউরোপের লোকেরা আরবদের কাছ থেকে এই ধরনের সংখ্যা জেনেছিল বলে এগুলিকে আরবী সংখ্যা বলা হয়। আরবরা কিন্তু এ ধরনের সংখ্যা জেনেছিল ভারতীয়দের কাছ থেকে। কাজেই এগুলিকে ভারতীয় সংখ্যা বলাই ঠিক।

বড় তাড়াতাড়ি সব কথা লিখছি। এখনও আমরা আরবদের কথায় এসে পৌঁছইনি।

নানা শ্রেণীর মানুষ

ছেলেমেয়েদের, এমনকী বড়দেরও, ইতিহাস শেখানো হয় এক অদ্ভুত উপায়ে। তারা রাজা এবং আরও কয়েকজনের নাম, যুদ্ধের তারিখ এবং ওই ধরনের কিছু শেখে। কিন্তু ইতিহাস কেবল যুদ্ধের সন-তারিখ আর অল্প যে ক'জন ব্যক্তি রাজা এবং সেনাপতি হয়েছিল তাদের কাহিনী নয়। ইতিহাস আমাদের শেখাবে একটি দেশের সাধারণ মানুষের কথা—কীভাবে তারা জীবনযাপন করত, তারা কী কী করেছিল এবং তারা কী চিন্তা করত। মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ, বিপদ এবং কীভাবে সে বিপদ তারা কাটিয়ে উঠেছিল—এইসব কথা ইতিহাস আমাদের শেখাবে। এভাবে ইতিহাস পড়লে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারব। আগের মতো একই ধরনের বিপদে বা কষ্টে যদি পড়তে হয়, ইতিহাসের শিক্ষা তা কাটিয়ে উঠতে আমাদের সাহায্য করবে। অতীত দিনের কথা পড়া থাকলে আমরা বুঝতে পারব বর্তমানে আমাদের অবস্থা ক্রমেই ভাল হচ্ছে না মন্দ হচ্ছে, দেশের উন্নতি হয়েছে না অবনতি ঘটেছে।

আমাদের অবশ্যই উচিত অতীত কালের মহাপুরুষদের জীবনকাহিনী পড়ে শিক্ষা লাভ করা। সে সময় আরও বিভিন্ন মানুষের অবস্থা কী রকম ছিল সে কথাও আমাদের জানা উচিত।

তোমাকে অনেকগুলি চিঠি লিখেছি। এবারেরটি হল চব্বিশ নম্বর চিঠি। এ পর্যন্ত আমি কেবল প্রাচীন কাল নিয়ে আলোচনা করেছি—যে সময়ের কথা আমরা বিশেষ জানি না। এই সময়টিকে বড় জোর বলা যায় ইতিহাসের শুরু বা ইতিহাসের ঊষালগ্ন। শীঘ্রই আমরা পরের যুগের কথা আলোচনা করব। এই যুগ সম্বন্ধে আমরা অনেক বেশি জানি এবং এই যুগকে ঐতিহাসিক যুগ বলতে পারি। প্রাচীন যুগের সভ্যতার বিষয়ে আলোচনা শেষ করার আগে আমরা আর একবার পিছন ফিরে তাকাব। দেখব সে সময় কত বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ বাস করত।

আগে দেখেছি, প্রাচীন গোষ্ঠীর লোকেরা কীভাবে বিভিন্ন রকমের কাজ করতে শুরু করে। তখন কাজের শ্রেণীবিভাগ চালু হয়েছিল। আরও দেখেছি, গোষ্ঠীপতি কীভাবে নিজের পরিবারকে অন্যদের থেকে পৃথক করে নিয়ে নিজে কেবল দল পরিচালনার কাজটি করত। উঁচু স্তরের মানুষ হিসেবে সে গণ্য হতে থাকে। অন্য কথায় বলা যায়, গোষ্ঠীপতির পরিবারের লোকেরা অন্যদের থেকে এক পৃথক শ্রেণীতে পরিণত হয়। এভাবে দুটি শ্রেণীর মানুষ আমরা দেখতে পেলাম—এক শ্রেণী যারা অন্যদের চালনা করছে, হুকুম করছে, আর এক শ্রেণী যারা আসল কাজগুলি করছে। যারা দল পরিচালনা করত অবশ্যই তাদের অনেক বেশি ক্ষমতা ছিল এবং তারই জোরে তারা অন্যদের কাছ থেকে যত বেশি সম্ভব জিনিসপত্র আদায় করত। ক্রমেই বেশি পরিমাণে আদায় করার ফলে তারা, যারা আসল কাজ করত তাদের চেয়ে, বড়লোক হয়ে উঠল।

এইভাবে কাজের বিভাগ শুরু হয় এবং তার ফলে কয়েকটি শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এক শ্রেণী হল রাজা, তার পরিবারবর্গ এবং রাজদরবারের অমাত্য। এরা দেশ পরিচালনা করত এবং দেশকে রক্ষা করতে যুদ্ধ করত। এ ছাড়া তারা সাধারণত অন্য কোনও কাজ করত না।

দ্বিতীয় শ্রেণী হল মন্দিরের পুরোহিত এবং মন্দিরের কাজের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য ব্যক্তি। তখনকার দিনে এরা ছিল অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। এদের কাজের বিষয়ে পরে আলোচনা করব।

তৃতীয় শ্রেণীতে ছিল ব্যবসায়ী। এরা এক দেশ থেকে অন্য দেশে জিনিসপত্র নিয়ে যেত। এরা জিনিস বেচা-কেনা করত এবং দোকান খুলে বসত।

চতুর্থ শ্রেণীতে ছিল কারিগর। এরা সব রকম জিনিস তৈরি করত। এরা সুতো কেটে কাপড় বুনত, মাটির জিনিস তৈরি করত, পিতল, সোনা, হাতির দাঁতের জিনিস এবং আরও নানা জিনিস তৈরি করত। বেশির ভাগ কারিগর শহরের মধ্যে বা তার কাছাকাছি অঞ্চলে বাস করত। গ্রামেও অনেকে থাকত।

সব শেষের শ্রেণীর মানুষ হল কৃষক ও শ্রমিক। এরা কাজ করত জমিতে ও শহরে। এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। অন্য শ্রেণীর মানুষেরা এদের কাছ থেকে কিছু-না-কিছু আদায় করার চেষ্টা করত।

AMARBOI.COM

রাজা, মন্দির ও পুরোহিত

আগের চিঠিতে আমরা দেখেছি সমাজে পাঁচটি শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণী। কৃষক জমিতে লাঙল দিয়ে চাষ করত এবং খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করত। চাষী যদি এ কাজ না করত এবং অন্যরাও যদি জমিতে কাজ না করত, তাহলে কোনও খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যেত না। পাওয়া গেলেও তার পরিমাণ হত নেহাত অল্প। কাজেই কৃষক ছিল সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তারা না থাকলে সকলকে অনাহারে থাকতে হত। শ্রমিকরাও জমিতে এবং শহরে অনেক প্রয়োজনীয় কাজ করত। শস্যক্ষেত্রে দরকারি সব কাজ, যার প্রত্যেকটি মানুষের উপকারে লাগে, করলেও শ্রমিকরা এজন্যে বিশেষ কিছুই পেত না। তারা যা উৎপাদন করত তার বেশির ভাগ চলে যেত অন্যদের দখলে, বিশেষ করে রাজা, তার পারিষদ ও অন্যান্য পদস্থ মানুষের কাছে।

আমরা আগে দেখেছি রাজা ও তার পারিষদেরা ছিল প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী। প্রথম যুগে গোষ্ঠীই ছিল সমস্ত জমির মালিক, পৃথক কোনও ব্যক্তি নয়। কিন্তু রাজা ও তার পারিষদদের ক্ষমতা বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তারা বলল যে তারাই হল জমির মালিক। এভাবে তারা হয়ে দাঁড়াল জমিদার। আর যে কৃষকেরা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে জমিতে কাজ করত তারা হয়ে দাঁড়াল একহিসাবে জমিদারের ভৃত্য। জমিতে কৃষক যা কিছু উৎপন্ন করত তা ভাগ করা হত, এর বড় অংশ চলে যেত জমিদারের ঘরে।

কোনও কোনও মন্দিরেরও নিজস্ব জমি ছিল। এই হিসাবে মন্দিরও ছিল জমিদার।

এখন দেখা যাক, এইসব মন্দির ও তার পুরোহিতেরা কেমন মানুষ ছিল। আগের একটি চিঠিতে তোমাকে বলেছি যে বর্বর মানুষ অনেক কিছু বুঝতে পারত না এবং যা তারা বুঝত না তাকে ভয় করত। এভাবে ভয় পাওয়া থেকেই মানুষের মনে দেবতা ও ধর্মের বিষয়ে ভাবনাচিন্তা দেখা দেয়। প্রতিটি বস্তুকে তারা দেবতা বা দেবী বলে মনে করত। যেমন, নদী, পাহাড়, সূর্য, বৃক্ষ, জীবজন্তু এবং ভূতপ্রেতের মতো আরও কিছু জিনিস যা চোখে দেখতে পাওয়া যায় না, কেবল কল্পনা করে নিতে হয়। ভয় পেয়ে তারা সর্বদা ভাবত দেবতারা তাদের শাস্তি দিতে চাইছে। এই দেবতারা ছিল তাদেরই মতো রুঢ় এবং নিষ্ঠুর। লোকে সর্বদা দেবতাদের উদ্দেশে কিছু উৎসর্গ করে তাদের সন্তুষ্ট করতে চাইত।

এইসব দেবতার জন্য মন্দির গড়ে উঠল। মন্দিরের মধ্যে একটি বিশেষ কক্ষকে পবিত্র স্থান মনে করা হত এবং সেখানে দেবতার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পুজো করা হত। যা চোখে দেখা যায় না এমন কিছুকে তারা পুজো করতে পারত না। এটা একটু কঠিন ব্যাপার। তুমি জানো, একটি শিশু চোখের সামনে যা দেখবে কেবল তারই কথা ভাবতে পারে। প্রথম যুগে মানুষের স্বভাব ছিল অনেকটা শিশুর স্বভাবের মতো। মূর্তি ছাড়া তারা পুজো করতে পারত না; সেজন্যে মন্দিরে মূর্তি বসিয়েছিল। অদ্ভুত ব্যাপার হল এই মূর্তিগুলি দেখতে সাধারণত ভয়ঙ্কর কুৎসিত—কোনটা জন্তুর মতো, কোনটা অর্ধেক মানুষ অর্ধেক জন্তু। মিশরের লোকেরা একসময় বেড়াল পুজো করত, আবার একসময় পুজো করত বানরের। কেন যে মানুষ এমন বীভৎস চেহারার মূর্তি পুজো করত তার কারণ বুঝতে পারা খুব কঠিন। কোনও মূর্তিই যদি পুজো করতে হয়,

তাহলে সেগুলি আরও সুন্দর করে তৈরি করলেই তো হত। মনে হয়, তাদের ধারণা ছিল দেবতা হবেন এমন একজন যাঁকে দেখলেই ভয় হবে এবং সেজন্যে তারা এমন ভয়ঙ্কর মূর্তি গড়েছিল। সে যুগের মানুষ এখনকার অনেকের মতো একজনকে বা একটি বড় শক্তিকে ঈশ্বর বলে ভাবত না। তারা ভাবত অনেক দেব-দেবী আছে, সময় সময় তারা এমনকী নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি করে থাকে। বিভিন্ন রাজ্যে ও শহরে বিভিন্ন রকমের দেব-দেবীর পুজো করা হত।

মন্দিরগুলিতে স্ত্রী পুরুষ দু শ্রেণীরই অনেক পুরোহিত থাকত। সাধারণত পুরোহিতেরা লেখাপড়া জানত এবং অন্যদের চেয়ে তারা ছিল বেশি শিক্ষিত। সেজন্যে তারা রাজার পরামর্শদাতা হয়েছিল। সে যুগে পুরোহিতেরা বই লিখত কিংবা তা নকল করে রাখত। কিছু শিক্ষাদীক্ষা থাকায় পুরোহিতদের সে সময় বিজ্ঞ মানুষ বলে মনে করা হত। তারা চিকিৎসাও করত। নিজেরা কত চালাক তা অন্যদের বোঝানোর জন্যে তারা প্রায় নানারকম কৌশল দেখাত। সাধারণ লোকেরা ছিল অত্যন্ত সরল এবং নির্বোধ, পুরোহিতদের জাদুকর ভেবে তাদের ভয় করে চলত।

সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে পুরোহিতেরা সবরকমভাবে জড়িয়ে ছিল। তারা ছিল সবচেয়ে বিজ্ঞ মানুষ। সেজন্যে কোনও বিপদে পড়লে বা অসুস্থ হলে সাধারণ লোক তাদের কাছে আসত। সাধারণ লোকের জন্য তারা বড় বড় উৎসবের আয়োজন করত। সে সময়ে, বিশেষ করে সাধারণ মানুষের জন্যে কোনও পঞ্জিকা ছিল না। উৎসবের হিসাবে মানুষ তখন দিন গণনা করত।

পুরোহিতেরা প্রায়ই লোককে প্রতারিত করে ভুল পথে চালনা করত। কিন্তু তারা মানুষকে নানাভাবে সাহায্যও করেছিল এবং তার ফলে মানুষের জীবনে অনেক উন্নতি ঘটেছে।

এমনও হতে পারে, মানুষ যখন প্রথম শহরে বসবাস করতে শুরু করল তখন তাদের পরিচালনা করত পুরোহিতেরা, কোনও রাজা নয়। রাজা দেখা দেয় পরে এবং যেহেতু তারা ভালভাবে যুদ্ধ করতে জানত সেজন্যে তারা পুরোহিতদের আসন দখল করে নেয়। কোনও কোনও দেশে রাজা ও পুরোহিত ছিল একই ব্যক্তি। যেমন মিশরের ফ্যারাও। ফ্যারাওদের জীবিতকালে লোকে তাদের অর্ধ-দেবতা বলেও মনে করত। মৃত্যুর পর তাদের দেবতা হিসাবে পুজো করা হত।

AMARBOI.COM

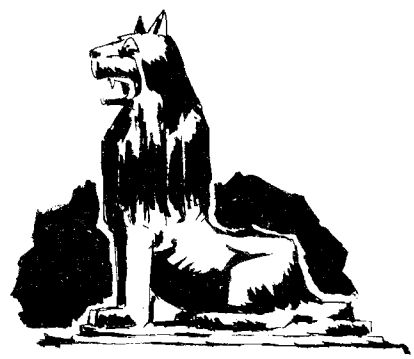

ফিরে দেখা

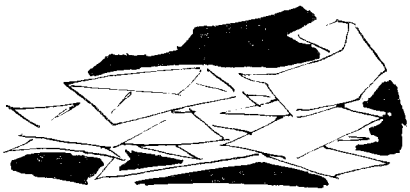

আমার চিঠি পড়তে পড়তে তুমি কি ক্লান্ত বোধ করছ? মনে হয় তোমার কিছুদিন বিশ্রাম নেওয়া দরকার। কিছুদিন নতুন কোনও বিষয়ে তোমায় লিখব না। এতদিন যে সব কথা লিখেছি সেগুলির বিষয়ে ভেবে দেখো। মাত্র কয়েকটি চিঠিতে লক্ষ লক্ষ বছরের ঘটনা দ্রুতগতিতে বলে এসেছি। যখন পৃথিবী ছিল সূর্যের অংশ সেই সময় থেকে শুরু করেছিলাম। তারপর দেখেছি কীভাবে তা সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে আসে। তারপর চাঁদের জন্ম হল। দীর্ঘকাল পৃথিবীতে প্রাণের কোনও চিহ্ন ছিল না। তারপর লক্ষ লক্ষ বছর পার হয়েছে। লক্ষ বছর বলতে কত দীর্ঘ সময় বোঝায় তা কী তুমি ধারণা করতে পারবে? ধীরে ধীরে প্রাণের বিকাশ ঘটল। লক্ষ লক্ষ বছর যে কত দীর্ঘ সময় তা ধারণা করা খুবই কঠিন। তোমার বয়স এখন মাত্র দশ বছর। তুমি এখন কী-বা বড় হয়েছ! তোমাকে তো এখন তরুণীই বলা যায়! একশো বছর বেঁচে থাকলেই মনে হবে অনেক দিন হল। এরপর হাজার বছর। তারপর হাজারের কত গুণ বেশি হলে লক্ষ বছর হবে। এই সুদীর্ঘ কালের ধারণা বোধ করি আমাদের মাথায় ঢুকবে না। আমার নিজেদের খুব বড় মনে করি এবং ভাবি কত সামান্য জিনিস আমাদের বিব্রত এবং উদ্বিগ্ন করে তুলছে। কিন্তু পৃথিবীর সুদীর্ঘ কালের ইতিহাসের কাছে এসব সামান্য ছোটখাট ঘটনার মূল্য কতটুক? এই দীর্ঘকালের ইতিহাস পড়ে শিক্ষা গ্রহণ করলে আমাদের অনেক উপকার হবে, কারণ তখন আর ছোটখাট জিনিস নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন হব না।

মনে রেখো বহু বহু কাল পৃথিবীতে প্রাণের কোনও চিহ্ন ছিল না। তারপর দীর্ঘকাল ধরে কেবল সমুদ্রের বুকে প্রাণী দেখা গেছে। পৃথিবীর কোথাও তখন মানুষের আবির্ভাব ঘটেনি। জীবজন্তুরা জন্মেছে এবং লক্ষ লক্ষ বছর ধরে তারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়িয়েছে। তাদের শিকার বা হত্যা করার জন্যে কোনও মানুষ তখন ছিল না। অবশেষে মানুষ এল—আকারে অতি ক্ষুদ্র, ক্ষীণ, প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল। হাজার হাজার বছর ধরে আস্তে আস্তে সে শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং তার বুদ্ধি বাড়তে থাকে। অবশেষে সে একদিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাণী হয়ে উঠেছে, অন্য সব প্রাণীরা তার দাস হয়ে দাঁড়ায়, মানুষ যা বলে তারা তাই করে।

এরপরে আমরা সভ্যতার বিকাশ লক্ষ্য করি। কীভাবে সভ্যতার সূচনা হয়েছিল তা দেখেছি। এই বিকাশের ধারা পরে আমরা আলোচনা করব। লক্ষ লক্ষ বছরের কথা আমরা এখন আলোচনা করব না। চিঠিতে আমরা প্রায় চার-পাঁচ হাজার বছরের আগের কথায় এসে পৌঁছেছি। লক্ষ লক্ষ বছরের তুলনায় এই চার হাজার বছর সম্বন্ধে আমরা অনেক বেশি জানি। এই চার হাজার বছরের মধ্যে যথার্থভাবে মানুষের ইতিহাসে শুরু ও তার বিকাশ ঘটেছিল। বড় হয়ে তুমি বই পড়ে এই সময়ের ইতিহাসের অনেক কথা জানতে পারবে। এ বিষয়ে অল্প কথাই তোমাকে লিখব। আমাদের এই ছোট পৃথিবীতে মানুষের জীবনে কী কী ঘটেছিল, সে বিষয়ে তোমার মনে শুধু একটা ধারণা করিয়ে দিতে চাই।

AMARBOI.COM

ফসিল এবং ধ্বংসাবশেষ

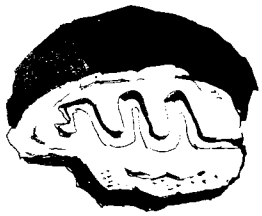

অনেক দিন তোমাকে চিঠি লিখিনি। আগের সব চিঠিতে প্রাচীন যুগ সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছি শেষ দুটি চিঠিতে সেই কথায় ফিরে গিয়েছিলাম। তোমাকে মাছের ফসিলের কয়েকটি ছবি পাঠিয়েছিলাম যাতে ফসিল জিনিসটা কী তার একটা মোটামুটি ধারণা তোমার হয়। মুসৌরীতে যখন আমাদের দেখা হয়েছিল তোমাকে অন্য ধরনের ফসিলের ছবি দেখিয়েছিলাম।

বিশেষ করে সরীসৃপের ফসিলের ছবি হয়তো তোমার মনে পড়বে। যে সব প্রাণী বুকে ভর দিয়ে চলে তাদের সরীসৃপ বলা হয়। যেমন, সাপ, টিকটিকি, কুমির, কচ্ছপ। এদের আমরা এখনও দেখতে পাই। প্রাচীন কালের সরীসৃপরা ছিল এখনকার সরীসৃপের মতো একই শ্রেণীর তবে তারা ছিল ভিন্ন ধরনের। তাদের আকৃতি ছিল খুব বড়। তোমার মনে পড়বে সাউথ কেনসিংটন মিউজিয়ামে আমরা কয়েকটি বৃহৎ আকারের পশুর দেহ দেখেছিলাম। তাদের একটি ত্রিশ থেকে চল্লিশ ফুট লম্বা। মানুষের চেয়েও বড় আকারের একধরনের ব্যাঙ ছিল। কচ্ছপের চেহারাও ওই রকম বড়। বিশাল চেহারার বাদুড় ঘুরে বেড়াত। ইগুয়ানোডন নামে একটি প্রাণী দাঁড়ালে ছোট গাছের মতো লম্বা দেখাত।

তুমি প্রাচীন কালের গাছের ফসিলও দেখেছ। পাথরের উপর ফার্ন, লতাপাতা এবং পাম গাছের সুন্দর সুন্দর চিহ্ন।

সরীসৃপদের বহু কাল পরে আসে স্তন্যপায়ী প্রাণী। এরা সন্তানদের বুকের দুধ খাওয়ায়। এখন আমরা চারপাশে যে সব প্রাণী দেখি তারা এবং আমরা নিজেরাও স্তন্যপায়ী জীব। এখনকার অনেক স্তন্যপায়ী প্রাণীর সঙ্গে সে যুগের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের বিশেষ পার্থক্য ছিল না। তাদের আকার ছিল খুব বড়, তবে সরীসৃপদের মতো অত বড় নয়। তখন বিরাট দাঁতওলা হাতি এবং মস্ত বড় ভালুক ছিল।

মানুষের ফসিলও তুমি দেখেছ। তা আমাদের মনে তেমন কৌতূহল জাগায় না, কারণ সেগুলি হল শুধু হাড় আর মাথার খুলি। এর চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণ করেছিল সে যুগের মানুষের তৈরি পাথরের অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতি।

মিশরের সমাধিস্থান এবং মমির কয়েকটি সুন্দর ছবিও তোমাকে দেখিয়েছিলাম। তোমার মনে পড়বে এর মধ্যে কতকগুলি ছিল খুবই সুন্দর। কাঠের শবাধারের উপর সুন্দরভাবে আঁকা ছিল মানুষের জীবনের কত দীর্ঘ কাহিনী। থীবস শহরে মিশরীয়দের সমাধিস্থানের দেয়ালে আঁকা ছবিগুলি আমাদের খুব মুগ্ধ করেছিল।

মিশরের থীবস শহরের অনেক প্রাসাদ এবং মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের ছবিও তুমি দেখেছ। এগুলি প্রকাণ্ড থামওলা বিশাল সব অট্টালিকা। থীবসের কাছে একটি বিরাট মূর্তি আছে। একে বলা হয় মেমননের মূর্তি।

যে ছবিগুলি পাঠিয়েছি তার মধ্যে উত্তর মিশরের (Upper Egypt) কার্নাক শহরের মন্দির এবং অট্টালিকার ধ্বংসস্তূপের ছবি আছে। এই ছবি দেখেই তুমি ধারণা করতে পারবে প্রাচীন মিশরীয়রা ঘড়বাড়ি তৈরির কাজে কী ভীষণ দক্ষ ছিল। ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা ভালভাবে না জানলে তারা এরকম বড় বড় মন্দির ও প্রাসাদ তৈরি করতে পারত না।

AMARBOI.COM

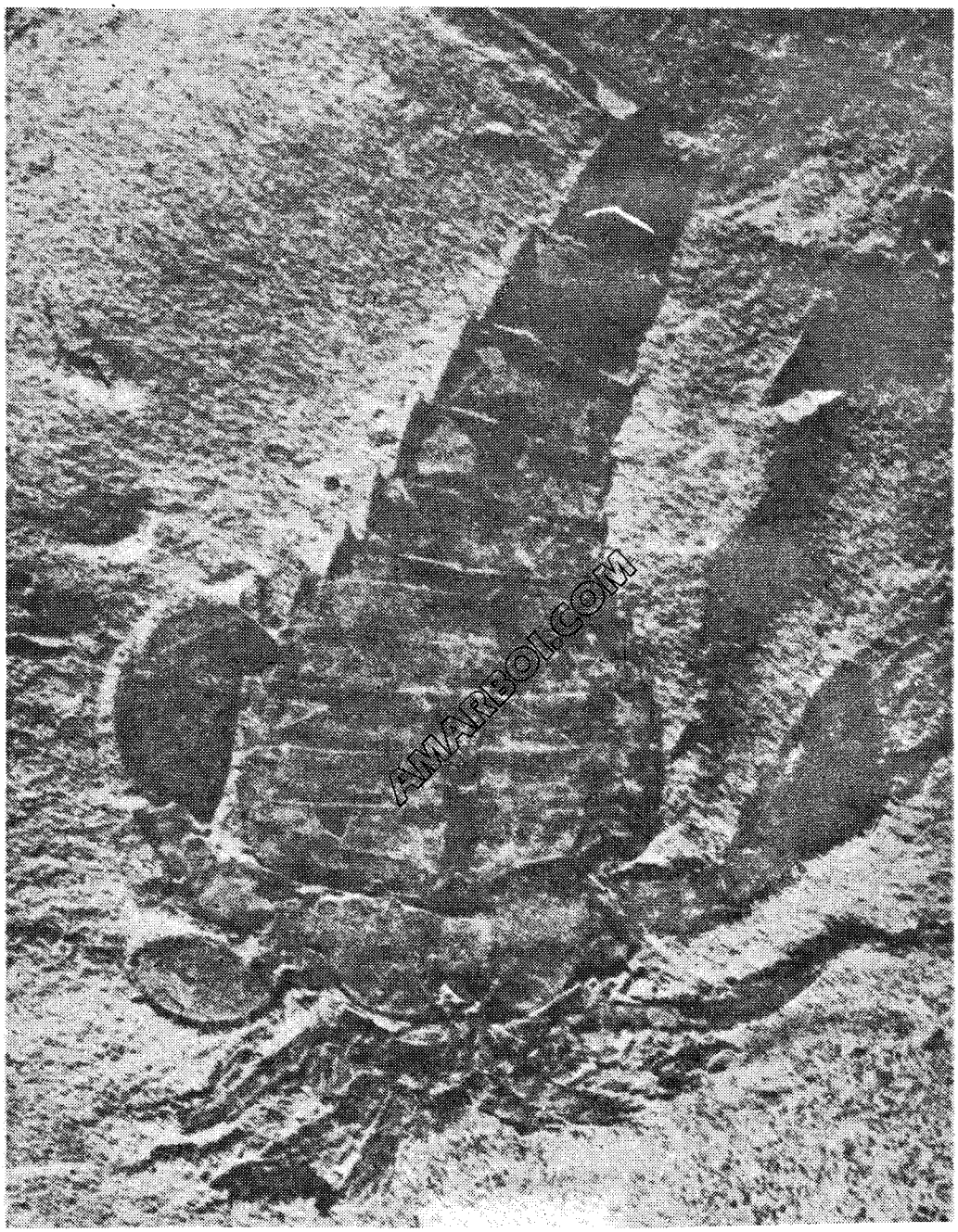
AMARBOI.COM

পিছন ফিরে আমাদের অতীত দিনের ইতিহাসের কথা সংক্ষেলে বলা এখানেই শেষ করছি। পরের চিঠিতে আমরা আবার এগিয়ে যাব।

আর্যরা ভারতে এল

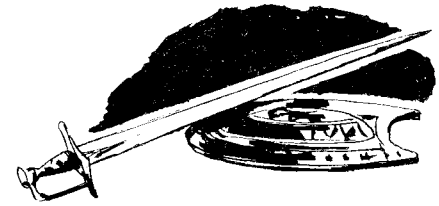

এ পর্যন্ত আমরা অতি প্রাচীন যুগের বিষয়ে আলোচনা করেছি। এবার আমরা দেখব মানুষ কীভাবে উন্নতি করেছিল এবং তারা কী কী করেছিল। এই প্রাচীন যুগকে বলা হয় প্রাগৈতিহাসিক যুগ, অর্থাৎ ইতিহাস শুরু হওয়ার পূর্বেকার যুগ। এই সময়ের সত্যিকার কোনও ইতিহাস আমরা পাই না। অনেকটাই আমাদের অনুমান করে নিতে হয়। এবার আমরা একেবারে ইতিহাসের যুগের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি।

দেখা যাক, ভারতে প্রথম দিকে কী ঘটেছিল। আগেই দেখেছি, মিশরের মতো ভারতেও প্রাচীন কালে একটি সভ্যতা বিকাশ লাভ করেছিল। তখন লোকে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। ভারতের তৈরি জিনিস জাহাজে করে মিশর, মেসোপটেমিয়া এবং আরও অন্যান্য দেশে পাঠানো হত। তখন যারা ভারতে বাস করত তাদের বলা হত দ্রাবিড়। এখন দক্ষিণ ভারতে মাদ্রাজ অঞ্চলে যে সব মানুষ আমরা দেখি তারা হচ্ছে কেই দ্রাবিড় জাতির বংশধর।

উত্তর ভারত থেকে আর্যরা দ্রাবিড়দের আক্রমণ করেছিল। সে সময় মধ্য এশিয়ায় বিপুল সংখ্যায় আর্য জাতির লোক বসবাস করত। সেখানে সকলের জন্যে খাদ্য সংগ্রহ করা সম্ভব না হওয়ায় তারা অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাদের একটি বিরাট দল চলে গেল পারস্যে এবং এমনকী আরও পশ্চিমে গ্রিস দেশে। কাশ্মীরের কাছে পাহাড় পেরিয়ে তারা দলে দলে ভারতে প্রবেশ করেছিল।

আর্যরা যুদ্ধ করতে পটু ছিল। তারা দ্রাবিড়দের তাড়িয়ে দিল। উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে দলে দলে আর্যরা ভারতে প্রবেশ করতে থাকে। প্রথমে দ্রাবিড়েরা হয়তো তাদের গতিরোধ করতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু আর্যদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকায় তাদের আর গতিরোধ করা গেল না। দীর্ঘ কাল ধরে আর্যরা উত্তরে কেবলমাত্র পঞ্জাব ও আফগানিস্তানে রইল। তারপর তারা আরও নীচে নেমে যে অঞ্চলকে এখন যুক্তপ্রদেশ বলা হয়, এবং যেখানে আমাদের বাড়ি, সেখানে এসে পৌঁছল। তারা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত মধ্য ভারতের বিন্ধ্যপর্বতের কাছে এসে থামল। এখানকার গহন অরণ্য পার হয়ে যাওয়া সহজ ছিল না। সুতরাং দীর্ঘকাল আর্যরা বিন্ধ্যপর্বতের উত্তর দিকের অঞ্চলে বসবাস করত। তাদের মধ্যে অনেকে পর্বত পার হয়ে দক্ষিণ দিকে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের পক্ষে দলে দলে যাওয়া সম্ভব হয়নি। সেজন্যে দক্ষিণ ভারত প্রধানত দ্রাবিড়দের বাসভূমি হয়েই রইল।

ভারতে আর্যদের আসার কাহিনী পড়লে খুব বিস্মিত হতে হয়। আর্যদের সম্বন্ধে অনেক কথা তুমি পুরনো সংস্কৃত বই থেকে জানতে পারবে। বেদ-এর মতো কতকগুলি বই এই সময় লেখা হয়েছিল। সবচেয়ে প্রাচীন বেদ হল ঋক্‌বেদ। এই বই থেকে তুমি জানতে পারবে ভারতের কোন অংশ আর্যরা অধিকার করেছিল। অন্যান্য বেদ এবং পুরাণের মতো অন্য পুরনো সংস্কৃত বই থেকে আমরা জানতে পারি কেমন করে আর্যরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এইসব পুরনো বইয়ের বিষয়ে হয়তো তুমি তেমন কিছু জানো না। বড় হলে তুমি আরও বেশি জানতে পারবে। কিন্তু এমনকী এখনও তুমি এমন অনেক গল্প জানো যেগুলি পুরাণ থেকে নেওয়া হয়েছে। আরও কিছুকাল পরে রামায়ণ এবং তারও পরে মহাভারত নামে দুটি মহাকাব্য

লেখা হয়েছিল।

এইসব বই থেকে আমরা জানতে পারি আর্যরা যখন কেবলমাত্র পঞ্জাব ও আফগানিস্তানে বসবাস করত তখন এই অঞ্চলকে বলা হত 'ব্রহ্মাবর্ত'। আফগানিস্তানকে তখন বলা হত 'গান্ধার'। মহাভারতের গান্ধারীর কথা কি তোমার মনে পড়বে? গান্ধার বা আফগানিস্তান থেকে তিনি এসেছিলেন বলে তাঁর নাম হয়েছিল গান্ধারী। আফগানিস্তান এখন ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন একটি পৃথক দেশ। কিন্তু সে সময় এই দুটি মিলে ছিল একটি দেশ।

আর্যরা যখন নীচে নামতে নামতে গঙ্গা ও যমুনার সমতলভূমিতে এসে পৌঁছয়, তখন তারা উত্তর ভারতের নাম দিয়েছিল আর্যাবর্ত।

প্রাচীন কালের অনেক জাতির মতো আর্যরা নদীর ধারের শহরগুলিতে বসবাস করতে থাকে। কাশী বা বারাণসী, প্রয়াগ এবং আরও অনেক শহর ছিল নদীর ধারে।

ভারতের আর্যরা কেমন মানুষ ছিল

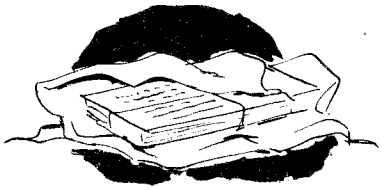

AMARBOI.COM

পাঁচ থেকে ছ' হাজার বছর কিংবা তারও আগে আর্যরা ভারতে এসেছিল। অবশ্য তারা সবাই একসঙ্গে আসেনি। হাজার হাজার বছর ধরে একের পর এক এসেছে সৈন্যদলের পর সৈন্যদল, গোষ্ঠীর পর গোষ্ঠী এবং পরিবারের পর পরিবার। কল্পনা করে দেখ, দীর্ঘ যাত্রীদল চলেছে তাদের গৃহস্থালীর সব জিনিসপত্র গাড়িতে বা পশুদের পিঠে চাপিয়ে। এখন ভ্রমণকারীরা যেভাবে আসে তারা সেভাবে আসেনি। তাদের ফিরে যাবার কোনও প্রশ্ন ছিল না। তারা এসেছিল এদেশে বাস করতে, না হলে তারা যুদ্ধ করে মরতে প্রস্তুত ছিল। তোমাকে আগে বলেছি, এদের বেশির ভাগ এসেছিল উত্তর-পশ্চিমের পাহাড় পার হয়ে। কিছু হয়তো এসেছিল পারস্য উপসাগর থেকে সমুদ্রপথে এবং ছোট ছোট জাহাজে করে সিন্ধু নদে এসে তারা পৌঁছেছিল।

এই আর্যরা কী রকম মানুষ ছিল? তারা যে সব বই লিখেছিল তা থেকে আমরা তাদের বিষয়ে অনেক কথা জানতে পারি। বেদ এবং ওই ধরনের কয়েকটি বই হল পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো বই। প্রথম দিকে এগুলি লেখা বই ছিল না। কথাগুলি লোকের মুখে মুখে ফিরত, আবৃত্তি করে এবং গান গেয়ে অন্যদের শোনানো হত। বইগুলি এত সুন্দর সংস্কৃত ভাষায় লেখা যে তা ইচ্ছে করলে তুমি গান গেয়ে শোনাতে পারো। এমনকী আজও কোনও সংস্কৃত-জানা মানুষের মধুর কণ্ঠে বেদ-পাঠ শুনলে মন আনন্দে ভরে যায়। হিন্দুদের কাছে বেদ এক পবিত্র গ্রন্থ। বেদ শব্দটির অর্থ কী? এর অর্থ হল জ্ঞান। সে যুগের বিজ্ঞ মানুষেরা, যাদের ঋষি এবং মুনি বলা হয়, যে জ্ঞান আহরণ করেছিলেন সেই জ্ঞানের কথা বেদ-এ লেখা আছে। তখন কোনও রেলগাড়ি, টেলিগ্রাফ এবং সিনেমা ছিল না। তার অর্থ এই নয় যে তখনকার মানুষ অজ্ঞ ছিল। কারও

কারও মতে এখনকার মানুষের তুলনায় সে যুগের মানুষ আরও জ্ঞানী ছিলেন। তাঁরা জ্ঞানী হোন বা নাই হোন, তাঁরা যে সব আশ্চর্য সুন্দর বই লিখে গেছেন আজও মানুষ তা মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করে থাকে। এ থেকেই বুঝতে পারা যায় প্রাচীন কালের সেই ব্যক্তিরা কীরকম মহাজ্ঞানী ছিলেন।

আগেই বলেছি, বেদ প্রথমে লেখা বই ছিল না। মানুষ কথাগুলি মুখস্ত করে রাখত। এভাবে বংশ পরম্পরায় বেদ মুখে মুখে আবৃত্তি হয়ে চলে এসেছে। সে যুগে মানুষের স্মৃতিশক্তি ছিল আশ্চর্য প্রখর। আমাদের মধ্যে ক'জন পুরো একটি বই মুখস্ত করে রাখতে পারি?

যে সময়ে এইসব বেদ লেখা হয় সে যুগকে বলা হয় বৈদিক যুগ। প্রথমে যে বেদ লেখা হয় তার নাম ঋক্‌বেদ। বইটি ছিল শুধু স্তব, স্তোত্র আর গান। আর্যরা এগুলি নিয়মিত গাইত। তারা খুব হাসি-খুশি মেজাজের মানুষ ছিল। তারা কখনও বিষণ্ণ থাকত না, বরং তাদের জীবন ছিল আনন্দ ও উত্তেজনায় ভরা। মন যখন আনন্দে ভরে উঠত, তারা সুন্দর সুন্দর গান রচনা করত। যে দেবতাদের তারা পুজো করত তাদের উদ্দেশ করে তারা সেই গান গাইত।

নিজেদের এবং নিজেদের জাতি সম্বন্ধে আর্যদের খুব গর্ব ছিল। 'আর্য' শব্দটির অর্থ হল ভদ্রমানুষ, এক উচ্চ শ্রেণীর মানুষ। আর্যরা খুব স্বাধীনতাপ্রিয় ছিল। আর্যরা আদৌ তাদের বর্তমান ভারতীয় বংশধরদের মতো ছিল না। এখনকার ভারতবাসীর মনে সাহস নেই এবং স্বাধীনতা হারানোর জন্যে কোনও বেদনাবোধ নেই। পরাধীনতা এবং দাসত্বের চেয়ে প্রাচীন কালের আর্যদের কাছে মৃত্যু ছিল অনেক বেশি কাম্য।

আর্যরা ছিল নিপুণ যোদ্ধা। তারা কৃষিকাজ ভালভাবে জানত এবং বিজ্ঞানের বিষয়ে সামান্য কিছু জানত। সেজন্যে তারা কৃষিকাজকে বেশি গুরুত্ব দিত এবং যা কিছু কৃষিকাজে সাহায্য করত সেগুলিকেও তারা গুরুত্ব দিত। বড় বড় নদী থেকে তারা জল পেত। সেজন্যে তারা নদীকে ভালবাসত এবং নদীকে উপকারী বন্ধু বলে মনে করত। কৃষিকাজ এবং দৈনন্দিন জীবনে গোরু এবং ষাঁড় তাদের যথেষ্ট সাহায্য করত। গোরুর কাছ থেকে তারা দুধ পেত। দুধের উপযোগিতা তারা ভালভাবেই জানত। সেজন্যে এইসব প্রাণীদের তারা বিশেষভাবে যত্ন করত এবং তাদের প্রশংসা করে গান লিখেছিল। বহুকাল পরে, আসলে কী কারণে গোরুর যত্ন নেওয়া হয় তা ভুলে গিয়ে মানুষ গোরুকে পুজো করতে শুরু করেছিল। ভেবেছিল এতে সকলের মঙ্গল হবে।

নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে আর্যদের খুব গর্ব ছিল। ভারতের অন্যান্য অধিবাসীদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে পাছে তা নষ্ট হয় সেজন্যে তারা সর্বদা সাবধানে থাকত। নিয়ম-কানুন চালু করে তারা অন্যদের সঙ্গে সংমিশ্রণ বন্ধ করার চেষ্টা করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল আর্যরা যাতে অন্য জাতে বিয়ে না করে। এর ফলে দীর্ঘ কাল পরে, এখন যাকে আমরা জাতিভেদ প্রথা বলি সেই প্রথার উদ্ভব হয়। এখন অবশ্য তা একটি হাস্যকর প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছু লোক অপরকে ছুঁতে বা অপরের সঙ্গে বসে আহার করতে ভয় পায়। সৌভাগ্যের কথা, আমাদের মধ্যে এই মনোভাব ক্রমেই কমে আসছে।

AMARBOI.COM

রামায়ণ ও মহাভারত

ভারতে বৈদিক যুগ অর্থাৎ বেদ রচনার সময়ের পরে এল মহাকাব্যের যুগ। এই সময় দুটি মহাকাব্য লেখা হয়েছিল বলে এই যুগকে মহাকাব্যের যুগ বলা হয়। এই দুটি বৃহৎ কাব্যে মহান বীরদের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। তুমি জানো, এই কাব্য দুটির নাম হল রামায়ণ এবং মহাভারত।

মহাকাব্যের যুগে আর্যরা বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত উত্তর ভারতের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল। তোমাকে আগেই বলেছি, এই অঞ্চলটিকে বলা হত আর্যাবর্ত। সে সময় এখনকার সংযুক্ত প্রদেশের [বর্তমান উত্তরপ্রদেশ] নাম ছিল মধ্যদেশ। বাংলাদেশকে বলা হত বঙ্গ।

একটি মজার কথা শুনলে মনে হয় তোমার ভাল লাগবে। ভারতের মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে কল্পনা করো, হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্বতের মাঝখানে আর্যাবর্ত কোথায় ছিল। দেখবে জায়গাটি দেখতে অনেকটা আধখানা চাঁদের মতো। সেজন্যে ভারতের আর একটি নাম ছিল চন্দ্রদেশ। ইন্দু শব্দের অর্থ হল চাঁদ, সেজন্যে আর্যাবর্তকে বলা হত ইন্দু-দেশ।[১]

আর্যরা আধখানা চাঁদ খুব ভালবাসত। আধখানা চাঁদের মতো জায়গাকে তারা বিশেষ পবিত্র মনে করত। বারাণসীর মতো বড় বড় শহর আধখানা চাঁদের মতো দেখতে ছিল। এমনকী, তুমি জানো কিনা জানি না, এলাহাবাদে গঙ্গা এই রকম দেখতে।

রামায়ণ হল রামচন্দ্র ও সীতার গল্প এবং লঙ্কার রাজা রাবণের সঙ্গে রামের যুদ্ধের কাহিনী। লঙ্কার বর্তমান নাম সিংহল। [সিংহলের নাম আবার বদল করে এখন রাখা হয়েছে শ্রীলঙ্কা।] মূল কাহিনীটি বাল্মীকি লিখেছিলেন সংস্কৃতে। বিভিন্ন ভাষায় রামায়ণের অনুবাদ হয়েছে। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত হল হিন্দিতে লেখা তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস'।

রামায়ণে বলা হয়েছে দক্ষিণ ভারতে বানরেরা রামকে সাহায্য করেছিল এবং হনুমান ছিল বানরদের এক বড় বীর। রামায়ণের কাহিনী হয়তো আসলে আর্যদের সঙ্গে দক্ষিণভারতের অধিবাসীদের যুদ্ধের কাহিনী। এই অধিবাসীদের নেতা ছিলেন রাবণ।

রামায়ণে অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প আছে। কিন্তু এখানে তাদের কথা বলছি না। তুমি নিজে তা পড়ে নেবে।

রামায়ণের অনেক পরে লেখা হয় মহাভারত। এটি আরও বড় বই। এতে বর্ণনা করা হয়েছে আর্যদের সঙ্গে দ্রাবিড়দের নয়, আর্যদের সঙ্গে আর্যদের এক মহাযুদ্ধের কাহিনী। যুদ্ধের বর্ণনার কথা ছাড়াও, অন্য দিক থেকে মহাভারত এক আশ্চর্য বই। এতে কত মহান আদর্শের কথা সুন্দর সুন্দর গল্পের মধ্যে বলা হয়েছে। এইসব ছাড়াও যে কারণে বইটি আমাদের সকলের প্রিয় তা হল, অনুপম কাব্য ভগবদ্‌গীতা এই মহাভারতের একটি অংশ।

হাজার হাজার বছর আগে এইসব বই ভারতে লেখা হয়েছিল। মহাজ্ঞানী ছাড়া এমন বই আর কে লিখতে পারেন? বহুকাল আগে লেখা হলেও এই বইগুলি আজও ভারতের লোক পড়ে। প্রতিটি শিশু এদের কথা জানে এবং প্রত্যেক বয়স্ক মানুষের জীবনে এইসব বইয়ের প্রভাব পড়েছে।

১. ইন্দিরাকে অন্যেরা আদর করে 'ইন্দু' বলে ডাকত।

AMARBOI.COM